Vol. 27 | No. 2 | 1984

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনার আদিপর্ব

Volume	27
Issue	2
Year	1984
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রোভারেণ্ড জেমস লঙ্
Published online	April 1, 1984
DOI	10.62328/Munier.Mufazzal.Anwar.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/Munier.Mufazzal.Anwar.1
Pages	35-80
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলা ছাপাখানা ও প্রকাশনার আদিপর্ব

রোভারেণ্ড জেমস্ লঙ্

[ষড়্বিংশ বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যার পর থেকে]

২২. আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই আনুমানিক সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। এখানে সম্ভবতঃ বছরে পঞ্জিকার ২,৫০,০০০ কপি প্রকাশিত হয়। দেশের যে-সব জায়গায় অন্য কোন বাংলা বই পৌঁছতে পারে না, সে-সব জায়গায়ও পঞ্জিকা বিক্রয় হয়। বাংলা সাল আরম্ভ হওয়ার ঠিক আগে কলকাতায় পঞ্জিকা বিক্রেতাদের ব্যস্ততার মৌসুম। তখন ছাপাখানাগুলি থেকে দলে দলে পুস্তক-ফেরীওয়ালাদের পঞ্জিকার বোঝা নিয়ে বের হয়ে আসতে দেখা যায়। এগুলি তারা দেশের সর্বত্র নিয়ে যায় এবং অতি সুলভে (৮০ পৃষ্ঠা এক আনা মূল্যে) বিক্রয় করে। এই বাংলা পঞ্জিকা বাঙ্গালীদের কাছে তাদের হুকা-পানের মতই অত্যাবশ্যকীয়। পঞ্জিকা ছাড়া তাদের পক্ষে বিয়ের শুভ দিন (বছরে ২২ দিন), ছেলের অন্নপ্রাশনের দিন (বছরে ২৭ দিন), গর্ভের পঞ্চম মাসে মাতাকে ভাত খাওয়ানোর দিন (বছরে ১২ দিন), গৃহ-নির্মাণ আরম্ভের কিংবা কান ফোঁড়ার দিন, ছেলের হাতে-খড়ি দেওয়ার দিন ও যাত্রার লগ্ন নির্ণয় করা কিংবা জ্বরের স্থায়িত্বকাল ও তীব্রতা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন।

আমাদের কাছে ১৩৫ বছরের পুরাতন একটি পঞ্জিকার পাণ্ডুলিপি আছে। আগেকার দিনে ছাপানো পঞ্জিকা বিক্রয় হতো প্রতি কপি এক টাকা দামে। এখন প্রতি কপি মাত্র দু'আনায় কিনতে পাওয়া যায়। পঞ্জিকা সস্তা দামে পাওয়া যায় বলে দেবজ্ঞ বা জ্যোতিষীদের আয় অনেক কমে গিয়েছে। ইউরোপের ডাক্তারদের মত এসব দৈবজ্ঞকে অনেক সময় স্ত্রীলোকদের কক্ষেও প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। মেসার্স কোন্স্ এন্ড কোং প্রচুর চিত্র সহকারে ৩০৪ পৃষ্ঠার একটি পঞ্জিকা প্রকাশ করেছে। গত বছর এই পঞ্জিকার ২০,০০০ কপি বাঙ্গালীরা খরিদ করেছিল।

কলকাতার ট্রাক্ট সোসাইটি এবং চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের কয়েকজন মিশনারী দেশীয় পঞ্জিকাগুলির বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে নিজেরা একটি পঞ্জিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু পঞ্জিকাটির কাটতি হয় নাই। কারণ এ-পঞ্জিকার বিষয়সমূহ ছিল এদেশের লোকদের রুচি-প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ বিজাতীয়। ১৮৫৪ ও ১৮৫৫ সালে ভার্নাকুলার লিটারেচার কমিটি প্রতি কপি চার আনা মূল্যে ২০০ পৃষ্ঠার একটি সুলভ পঞ্জিকা প্রকাশ করেছিল। প্রথম বছর পঞ্জিকাটির ২,৫০০ কপি বিক্রয় হয় কিন্তু পরের বছর বিক্রয় হয়

মাত্র ৪১৯ কপি। এত কম বিক্রয়ের কারণ, হিন্দুরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছিল যে পঞ্জিকাটি আকৃতি ও রচনা-রীতিতে তাদের পঞ্জিকাগুলির মত হলেও এবং এতে ঔষধ, উদ্ভিদ ও মেলা সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য থাকলেও, জ্যোতিষ-সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য এ-থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। নীচে এ-পঞ্জিকায় উল্লেখিত প্রতিদিনের বিষয়সমূহের একটি তালিকা দেওয়া হল। তালিকায় আছে "বছরের নির্দিষ্ট দিনে যে-সমস্ত ব্যাপার ঘটে তাদের এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের, যেমন, ছুটির দিন, সেশন আরম্ভ হওয়ার তারিখ, কালেক্টরের বিক্রয়ের দিন ইত্যাদির স্মারক। অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে বিনিময় চার্ট, বেতনের চার্ট, প্রত্যেক জেলার প্রচলিত ওজন ও মাপ, স্মল কজেস কোর্টের ফি-এর তালিকা ও নিয়মাবলী, ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন সনের তারিখের বিবরণ, জেলাগুলির নাম-সহকারে রাজস্ব ও বিচার বিভাগসমূহের তালিকা, সংশ্লিষ্ট থানাগুলির নাম-সহকারে পুলিশ উপ-বিভাগসমূহের তালিকা, উদ্যান-কর্মীদের জন্য বর্ষপঞ্জী, ঔষধ-পত্র, বেনারস অভিমুখী যাতায়াতের পথসমূহের নির্দেশিকা, পরিসংখ্যান, বিগত ১০০ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ইত্যাদি।"

এ-রকম সুপরিকল্পিত একটি পঞ্জিকার প্রকাশ এখনও সকলের একান্ত কামনার বিষয় হয়ে আছে।

২৩. অতিদ্রুত বিলীয়মান জগতের ইতিহাসকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলে যারা বিবেচনা করত তাদের মধ্যে যে ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ দেখা দিয়েছে তা অতি আশার কথা। ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত বই-পত্রের মধ্যে আছে স্মিথসের 'গ্রীসের ইতিহাস', 'পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', 'মহানুভব পিটার', 'উইলিয়ম টেল, আলেকজান্ডার ও তৈমুরের জীবন-চরিত', বার্থ রচিত 'চার্চের ইতিহাস' এবং 'কেপ্টেন রিচার্ডসনের জীবনী'। কলকাতা অধি-কারের ইতিহাস ছাড়াও আছে বাংলার ইতিহাস ৩টি, ভারতবর্ষের ইতিহাস ৮টি, পৃথিবীর ইতিহাস ২টি, রোমের ইতিহাস ৩টি, গ্রীসের ইতিহাস ৩টি, ইংল্যান্ডের ইতিহাস ৩টি, ইহুদীদের ইতিহাস ২টি, মিশরের ইতিহাস ১টি, পাঞ্জাবের ইতিহাস ১টি। এদের সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে গ্যালিলিও, নিউটন, হর্সশেল, লিনিয়াস, জোন্স্, হোমার, সাইরাস, সক্রেটিস, যুধিষ্ঠির, প্ল্যাটো, আলফ্রেড, সুলতান মোহাম্মেদ (মাহমুদ), মহানুভব পিটার এবং নয়জন বিখ্যাত হিন্দু রমণীর জীবন-চরিত।

২৪. বিক্রয়ের উদ্দেশ্য মুদ্রিত খ্রীস্টান ধর্মীয় পুস্তকাদির সংখ্যা খুবই নগণ্য, বছরের মোট মুদ্রিত পুস্তকের শতকরা দুই ভাগেরও কম। এ-থেকে বুঝা যায় যে একটি খ্রীস্টীয় সাহিত্যকে এখানকার মাটিতে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এখনও বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয় নাই। এটা সত্য যে এ-বছর ৭৬,৯৫০টি খ্রীস্টান ধর্মীয় বই-পত্র বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। হিন্দুরা এগুলি নিয়েছে এ-কারণে যে তারা কাগজ মাত্রকেই ঘরে ব্যবহারের কিংবা বিক্রয়ের জন্য মূল্যবান বলে মনে করে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে হিন্দুদের আপত্তির কথা বাদ দিলেও খ্রীস্ট ধর্মীয় পুস্তকাদি প্রাচ্য দেশীয় লোকদের অভিরুচি ও বাক-ভঙ্গি অনুযায়ী লিখিত নয় বলে এ-সংখ্যার মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক পুস্তকই বিক্রয়ের উপযোগী।[৩২]

অবশ্য সম্প্রতি এ-অবস্থার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা পুস্তকের জন্যে একজন বেতনভোগী সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন, একটি বাংলা সাময়িক-পত্রের প্রকাশনা আরম্ভ হয়েছে, বইগুলিকে চিত্রায়িত করার জন্যে খোদাইয়ের কাজ করা হয়েছে, দেশীয় লেখকদের উৎসাহিত করা হয়েছে এবং ১০০ পৃষ্ঠার বই এক আনা মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। তাদের প্রকাশিত বাংলা পুস্তকের একটি তালিকা নির্ঘণ্ট '১'-এ দেওয়া হয়েছে।

এই সোসাইটির প্রসঙ্গে কলকাতার ক্রিশ্চিয়ান স্কুল বুক সোসাইটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই সোসাইটি তার ১৮ বছরের জীবন-কালের মধ্যে মাত্র ৬টি স্কুলপাঠ্য বাংলা বই প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পাঠসংকলন ৪ টি, বস্তু সম্পর্কিত ১টি এবং ইহুদীদের ইতিবৃত্ত ১ টি। ইংরেজী মিশন স্কুলগুলিতে বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন এবং বাংলা স্কুলগুলিতে পাঠক্রম একান্তভাবে বাইবেল শিক্ষার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখার দরুণই এ-অবস্থার উদ্ভব হয়েছে।[৩৩]

২৫. চীনাদের মত হিন্দুদের মধ্যেও নাটকের প্রচলন রয়েছে। গত ২,০০০ বছর যাবৎ তারা নাটকের উৎকর্ষ সাধন করেছে এবং তাদের মধ্যে নাটকের রস-পিপাসা এখনও বজায় আছে। দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক আদিরসপূর্ণ যাত্রা বা নাটকের অভিনয় খুবই জনপ্রিয়। এ-সব অনুষ্ঠানে প্রচুর জনসমাগম হয়। আনন্দের কথা হচ্ছে যে কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি, পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত এ-সকল নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। এই নাটকগুলিতে আটপৌরে ভাষায়, এবং কখনো কখনো মলিয়ের-সুলভ ব্যঙ্গ সহকারে, বর্ণ ও বহু-বিবাহ প্রথার নিন্দা করা হয়। যেমন, 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব নাটক,' 'বিধবা বিবাহ নাটক' এবং 'সপত্নী নাটক'। মধুসূদন দত্ত রচিত 'শর্মিষ্ঠা নাটক' ছাড়াও 'রত্নাবলী' ও 'শকুন্তলা' নাটক মঞ্চে সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে।[৩৪]

অধুনা হিন্দু-সমাজে নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি পুনরায় নতুন করে আগ্রহ দেখা দিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে তাদের প্রাচীন নাটকসমূহের বঙ্গানুবাদ ইংরেজী নাটকের অনুবাদের চেয়ে প্রাচ্য দেশীয় লোকদের কাছে অনেক বেশী উপাদেয়। অবশ্য হরচন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষায় শেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অনুবাদ ও রূপান্তর করেছেন। তিনি 'কর্ণবিয়োগ' নামেও একটি নাটক রচনায় কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা প্রতাপ সিংহ এবং তরুণ জমিদার কালিপ্রসন্ন সিংহ। কালিপ্রসন্ন সিংহ সংস্কৃত থেকে 'মালতী-মাধব', 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'সাবিত্রী-সত্যবান' নাটক অনুবাদ করে নিজ ব্যয়ে বিতরণ করেছেন।

২৬. বঙ্গদেশে ইংরেজী স্কুলসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যেও বাংলা ভাষায় স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে। অধিকন্তু, ইংরেজী স্কুলগুলি ছাড়াও কলকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে তিনটি নর্মাল ভার্নাকুলার স্কুল রয়েছে। ইউক্লিড, বীজগণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, প্রাকৃতিক

ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তকসমূহ মাতৃভাষায় ব্যাখ্যা করার জন্যে এই স্কুলগুলি থেকে উন্নতমানের শিক্ষক সরবরাহ করা হচ্ছে। চাহিদাই সরবরাহের জনক। বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটায় এক শ্রেণীর অত্যন্ত উপযোগী পুস্তক রচিত হতে শুরু করেছে। চাহিদার প্রকৃতিই সরবরাহের প্রকৃতি ও মানের শ্রেষ্ঠ নির্ধারক।[৩৫]

চল্লিশ বছর আগে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাগণ কয়েক প্রস্থ প্রয়োজনীয় পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু পরবর্তী ত্রিশ বছর বাংলা শিক্ষা দারুণ ভাবে উপেক্ষিত হয়। কেবল চুচুড়া স্কুলের ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা শিক্ষার ব্যাপারে পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়। তখন প্রকাশ পায় যে সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বই-পত্র খুবই দুর্লভ। এ-সময় সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতদের লেখা উন্নতমানের পুস্তকসমূহ এগিয়ে গেল সোসাইটির বইগুলিকে পেছনে ফেলে। এ-জন্যেই দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালে যেখানে সংস্কৃত প্রেস মুদ্রিত করেছে ৮৪,২২০ খণ্ড বাংলা পাঠ্য-পুস্তক, সেখানে সরকারের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে মঞ্জুরী পাওয়া সত্ত্বেও স্কুল-বুক সোসাইটির পুস্তকের সংখ্যা মাত্র ৩২,০০০। বর্তমানে নিরঙ্কুশ পাঠ্য-বিষয়ে প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা নিম্নরূপ : কৃষি-৪, বীজগণিত-১, পাটিগণিত-৭, অভিধান ও শব্দকোষ-৬০, ইউক্লিড-১, ভূগোল ও মানচিত্র-৩৫, ব্যাকরণ-৩০, ইতিহাস ও জীবনী-৬০, প্রাকৃত ইতিহাস-২৫, প্রাথমিক পাঠ-সংকলন-৪০, উচ্চতর পাঠ-সংকলন-৩৫, প্রাকৃত দর্শন-২৩, স্কুল ব্যবস্থাপনা-২।

উপরোক্ত চিত্রের সঙ্গে ত্রিশ বছর আগেকার অবস্থার কতই না পার্থক্য। তখন একটি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকে সবেধন নীলমণি একখানা সিংহের ছবি থাকলেই যথেষ্ট হত। এখন জনৈক বাবু দেশীয় স্কুলগুলির জন্যে বর্ণনা সম্বলিত চিত্রাবলী প্রকাশ করে যাচ্ছেন। তার এই সিরিজগুলির প্রথমটিতে আছে একটি সিংহের চিত্র। পল্লী-বিদ্যালয়গুলিতে "শিশুবোধ" এখন পর্যন্ত অলীক ও আদিরসাত্মক বিষয়াদি সত্ত্বেও তার কায়েমী ব্যবস্থা বজায় রেখেছে। এক আনা মূল্যের ৫০ পৃষ্ঠার একটি সুলভ 'প্রথম পাঠ' বের না করা পর্যন্ত এই বইটিকে তার জায়গা থেকে হটিয়ে দেওয়ার কোন আশাই নাই। প্রচলিত স্কুল-পাঠ্য বইগুলির মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার শতকরা ২০০ ভাগ উর্ধ্বে রয়েছে।

পূর্বে উল্লেখিত পুস্তকসমূহের সিংহ-ভাগই এংলো-ভার্নাকুলার স্কুলগুলিতে এবং বাংলা বিদ্যালয়সমূহের উপরের শ্রেণীতে ব্যবহৃত হয়। দেখা গিয়েছে যে ইংরেজীতে স্কুলের বাংলা পড়ুয়া ছাত্রেরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই কিংবা সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকাদি যেমন উত্তমরূপে অধ্যয়ন করে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি গ্রন্থ তেমন ভাবে পাঠ করে না। তাছাড়াও, এদেশীয় লোকেরা বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ, গ্রীক ও ল্যাটিন পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত বিদেশী ভাষার চেয়ে, নিজেদের ভাষার মাধ্যমে অতি সহজে অধ্যয়ন করতে সক্ষম। বিজ্ঞান-বিষয় অধ্যয়নের এই ধারণা যে-চাহিদা সৃষ্টি করেছে তারই ফলে সম্প্রতি বাষ্পীয় এঞ্জিন সংক্রান্ত একটি অতীব প্রয়োজনীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। গত

কয়েক মাসে প্রধানতঃ মলটি ব্রান (Malte Brun) থেকে সংকলিত একটি ভূগোল এবং চেম্বার্সের আদর্শে প্রস্তুত একটি ভূ-চিত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছে। রাজেন্দ্রের 'প্রাকৃতিক ভূগোল'-এর দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়েছে। নয় মাসের মধ্যে প্রতি কপি এক টাকা মূল্যে ৮০০ কপি বিক্রয় হয়েছে।

আদিরসাত্মক কাহিনী—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ১৪,২৫০ কপি

আদিরসাত্মক পুস্তক বলতে তাদেরেই বুঝায় যাদের মধ্যে রয়েছে অশ্লীল বর্ণনার ছড়াছড়ি। অবশ্য এ-শ্রেণীর সমস্ত পুস্তককে উপরোক্ত সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। উন্নতমানের নীতিকাহিনী, নির্দোষ গল্প প্রভৃতি প্রকাশিত হওয়ার ফলে এ-জাতীয় পুস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। নীতি-উপদেশ দ্বারা যে-কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই, অশ্লীল পুস্তক প্রকাশনা বিরোধী আইনের আতঙ্কের ফলে সে-কাজ সহজেই সাধিত হচ্ছে।[৩৬] অশ্লীল পুস্তক প্রকাশনার বিরুদ্ধে আইন পাশ হওয়ার পূর্বে ২০টি কদর্য ছবি-সম্বলিত একটি অত্যন্ত অশ্লীল পুস্তকের ৩০,০০০ কপি বিক্রয় হয়েছিল ১২ মাসের মধ্যে। বর্তমানে এ-জাতীয় বই বিক্রয় করা হয় অত্যন্ত গোপনে। আগের মত প্রকাশ্যে সকলের চোখের সামনে আর রাখা হয় না। এ-শ্রেণীর পুস্তকের নামের জন্য 'নির্ঘণ্ট' দ্রষ্টব্য।

নীতিকথা, নীতিকাহিনী—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ৩৯,৭০০ কপি

শত শত বছর যাবৎ বাংলা ভাষায় যে-দুটি অতুলনীয় নীতিগ্রন্থ রয়েছে তাদের একটি হল ইসপের উপকথার আদলে পরিকল্পিত ও সংস্কৃত থেকে অনূদিত নীতিকাহিনী—'হিতোপদেশ'।[৩৭] অপর গ্রন্থটির নাম 'চানক্য শ্লোক', যা বঙ্গদেশ ও বিহারের সকল বিদ্যালয়ে মুখস্ত পড়ান হয়। হিন্দুদের প্রাচীন পুস্তকাদি এবং প্রচলিত প্রবাদসমূহ অসংখ্য সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্ম নীতি-বচনে পরিকীর্ণ। সাধারণ মানুষ এগুলি সর্বদাই মনে রাখে এবং বাক্যালাপের সময় বক্তব্যকে সুষ্ঠুতর করার উদ্দেশ্যে এগুলি ব্যবহার করে। প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন আকীর্ণ অনুবাদই এ-দেশের লোকদের বিশেষ প্রিয়।[৩৮]

নীতিকাহিনী শ্রেণীর পুস্তকাদির অভাব বহু বছর যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। ১৮১৯ সালে সংস্কৃত ভাষার অন্যতম দিক্‌পাল রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয়, রামকমল সেন ও অন্যান্যদের সহযোগিতায়, বাংলায় 'নীতি-কথা' জাতীয় পুস্তিকাসমূহ সংকলন করেন। বিবিধ সদ্‌গুণ ও কর্তব্যের কথাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পাকারে রূপান্তরিত করে লিখিত এ-সমস্ত পুস্তিকার দশ লক্ষ কপিরও বেশী বিক্রয় হয়েছে।

১৮১৯ সালে প্রকাশিত টি. দত্ত কর্তৃক সংকলিত 'মনোরঞ্জন ইতিহাস' বা 'উপাদেয় কাহিনী' নামক পুস্তক বিক্রয় হয়েছে পঞ্চাশ হাজারের বেশী। অতি সম্প্রতি সত্যের মহিমা-জ্ঞাপক কয়েকটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে আছে চেম্বার্সের Moral Class Book-এর রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত অনবদ্য অনুবাদ 'নীতিবোধ'; এ-পুস্তকের ১২ হাজারেরও বেশী কপি বিক্রয় হয়েছে এবং লেখকের লাভ হয়েছে প্রায় ৪,০০০ টাকা।

'নীতিবোধ' ছাড়া রয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প-সম্বলিত নৈতিক দায়িত্ব-বিষয়ক সচিত্র পুস্তক 'নীতি শিক্ষা'; বিবিধ নৈতিক কর্তব্য সম্পর্কিত অক্ষয় দত্তের অনুপম রচনা 'ধর্মশিক্ষা'; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচিত 'নীতিসার' এবং কেপ্টেন লী-র পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত রামনারায়ণ মিত্রের 'সত্য চন্দ্রোদয়'। এ-পুস্তকের কল্পিত কাহিনীর ঘটনাস্থল বর্ধমান এবং সমস্ত চরিত্রই ভারতবর্ষীয়। নিম্নে উপরোক্ত শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হল :

নাম	বিষয়
আনোয়ার সোহেলী	—পরিশ্রম ও সততা সম্পর্কে উপকথা (ফারসী থেকে)।
অষ্টক ৩৯	—জ্ঞান ও শিষ্টাচার-বিষয়ক; প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর (সংস্কৃত থেকে)।
চাতক অষ্টক	—আধ্যাত্মিক রুচি সম্পর্কিত নৈতিক রূপক (সংস্কৃত থেকে)।
জ্ঞান অর্ণব	—রিপু ও যুব সংসর্গ বিষয়ে ক্ষুদ্র গল্প ও কাহিনী।
জ্ঞান চন্দ্রিকা	—অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, জুয়া ও কৃতজ্ঞতার বিষয়ে নিবন্ধ।
জ্ঞানালোক	—অতিথিপরায়ণতা, লোভ ও ধৈর্য সম্পর্কে নিবন্ধ।
জ্ঞান প্রদীপ	—বাঙালী জীবন থেকে গৃহীত নীতি-গল্প।
মোহ মুদগর	—পার্থিব বিলাসিতার অসারতা সম্পর্কে ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক।
মেষপালক বিবরণ	—'A Shepherd of Salisbury plain'-এর বঙ্গানুবাদ।
পঞ্চরত্ন	—উদারতা, সাহস ও লালসা সম্পর্কিত।
পারিপিক ইতিহাস	—পশু-পাখীর কাহিনীভিত্তিক নীতি-কথা।
রাজদূত	—এডামস্-এর 'কিংস ম্যাসেঞ্জার্স'।
শান্তি শতক	—পার্থিব বিষয়াদির অসারতা।

আখ্যায়িকা—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ৩৩,০৫০ কপি

প্রাচ্যের অধিবাসীরা কাল্পনিক আখ্যায়িকার প্রতি যেরূপ আসক্ত তাতে এই সংখ্যা কম বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু হিন্দুদের দেব-দেবী সম্পর্কিত অধিকাংশ কিংবদন্তীগুলি যে-রীতি ও ভঙ্গিতে লিখিত তাতে সেগুলিই পাঠক বা শ্রোতাদের গল্পের তৃপ্তি দিয়ে থাকে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত আখ্যায়িকাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গ্রন্থগুলির অন্যতম হল আরব্যোপন্যাসের অনুবাদ। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ এই অনুবাদ 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত। 'টেলিমেকাস', 'রাসেলাস' 'পল ও ভার্জিনিয়া', 'রবিনসন ক্রুশো' ও 'এলিজাবেথ বা এক্‌জাইল্‌স্ অব সাইবেরিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকমহলের খুব প্রিয়। সেইরূপ সংস্কৃতের 'কাদম্বরী', 'দশকুমার', 'নল-দময়ন্তী', 'শকুন্তলা' ও 'বৃহৎ কথার' অনুবাদ এই সমাজে বিশেষ সমাদৃত। প্রায় এক শতাব্দী আগে ফিল্ডিং-এর মতই বলিষ্ঠতা ও বেলেল্লাপনা সহকারে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে রচিত কুরুচিপূর্ণ 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী এখনও তার আসন দখল করে আছে এবং ৬০ পৃষ্ঠা এক আনা মূল্যে বিক্রয় হচ্ছে। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'তোতানামা'রও প্রচুর কাটতি হচ্ছে।

বাংলায় এখন স্যার ডব্লিউ. স্কটের মত একজন লেখকের দরকার, যিনি গল্পকে ইতিহাস এবং অন্যান্য শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের বাহন করে ধীরে ধীরে পুরাতন প্রণয়-কাহিনীগুলিকে হটিয়ে দিতে পারবেন। অধুনা একজন স্থানীয় লোক ডিকেন্সের রীতিতে রচিত দুটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছে। 'আলাল দুলাল' ও 'মদ খাওয়া'[৪০] নামক এই দুটি গ্রন্থে দেশীয় সমাজের অনেক বদ-অভ্যাস উদ্‌ঘাটিত করে দেখান হয়েছে। এই বইগুলি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমরা জানি যে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গদেশের অভ্যন্তরের কোন এক শহরের স্থানীয় অধিবাসীরাই ১০০ কপি ক্রয় করেছিল। এই বইগুলিতে আটপৌরে ভাষা, প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন এবং বিভিন্ন রকমের চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। ঠিক অনুরূপ পরিকল্পনার ভিত্তিতেই ৩৫ বছর আগে ইয়ং বেঙ্গলদের ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছিল 'নববাবু বিলাস'। সেই বইটিরও বহুল প্রচার হয়েছিল।

আইন সংক্রান্ত পুস্তক—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ৪,০০০ কপি

আগের বছরগুলিতে দারোগার কর্তব্য, রাজস্ব আইন, বিবিধ রেগুলেশনের অনুবাদ, সদর রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থের বড় বড় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ফলে এখন, ১৮৫৭ সালে বাজারে যথেষ্ট সংখ্যক আইনের বই পাওয়া যাচ্ছে। এদেশের লোকজন যে, মামলা-মকদ্দমা প্রিয়, এদের দ্বারা প্রকাশিত শতাধিক আইন গ্রন্থ তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ-সব পুস্তকে আইনের আলোচনা করা হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়—নিছক প্রাত্যহিক ব্যবহারিক বিষয় হিসেবে।

বিবিধ পুস্তক—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ১৮,৩৭০ কপি

যে-সকল পুস্তক অন্য কোন শ্রেণীভুক্ত হয় নাই সেগুলিকেই এ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন চিকিৎসা, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তক। হস্তরেখা-বিদ্যা এদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'কাক-চরিত্র' (অর্থাৎ কাক কর্তৃক ভবিষ্যৎ গণনা) নামক গ্রন্থে ভবিষ্যৎ গণনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। এ-জাতীয় একটি পুস্তক গত ৪০ বছর যাবৎ প্রচুর বিক্রয় হচ্ছে।

এখানে দেশীয় ঔষধের ব্যবস্থা সম্পর্কিত চিকিৎসা-পুস্তক আছে অনেক। এ-জাতীয় একটি পুস্তক হচ্ছে হলধর সেন প্রণীত 'চিকিৎসার্ণব'। এর প্রায় ১,২০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ ইউরোপীয় ডাক্তারের মতে এ-দেশীয় লোকদের কাছেও অনেক মূল্যবান ঔষধ আছে। ভারতবর্ষীয় লোকদের জন্য কম দামী এবং অধিকতর উপযোগী বলে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ-সব ঔষধ আরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই পুস্তক-গুলিতে হাঁপানী রোগে ধুতুরার পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরী করে ধূমপানের, পেটের অসুখে বেলের ও দন্তশূলে ভাগভেরেণ্ডার উপকারিতা এবং এরকম আরও বহু রোগ প্রতিষেধকের কথা বলা হয়েছে। এই মূল্যবান ঔষধগুলি ইউরোপীয় ডাক্তারদের ব্যবহারের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু মেডিকেল কলেজে পড়া বাঙালী ডাক্তারেরা এই গ্রন্থগুলিকে কাজে লাগা-নোর চেয়ে রোগীদের দামী দামী ঔষধের ব্যবস্থা দেওয়া এবং নিজ নিজ বিদ্যা ভাঙিয়ে

পয়সা--কড়ি বানানোর প্রতিই বেশী অনুরক্ত। উড়িষ্যায় মি. বেচেলর নামক জনৈক মিশনারী চিকিৎসক গ্রাহমের 'Domestic Medicine'-এর আদর্শে উড়িয়া ভাষায় একটি বই প্রকাশ করে একটি যথার্থ সদ্‌কাজ করেছেন। এ-পুস্তকে তিনি ইউরোপীয় এবং দেশীয় উভয়বিধ চিকিৎসারই ব্যবস্থা দিয়েছেন। পুস্তকটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে এবং অনেক উপকারে আসছে। স্থানীয় বৈদ্য বা দেশীয় ডাক্তারদের কাছে চিকিৎসার বিষয়ে নানা রকম পাণ্ডুলিপি আছে।[৪১] এই পাণ্ডুলিপিগুলি কোন যোগ্য চিকিৎসা শাস্ত্রীয় পণ্ডিতের দ্বারা নিরীক্ষিত হলে এই আর্থিক অনটনের দিনে সস্তায় ও সহজে মূল্যবান ঔষধাদি পাওয়া যেতে পারত।

এদেশীয় চিকিৎসকদের পাণ্ডুলিপির তালিকা

পাণ্ডুলিপির নাম	বিষয়	রচয়িতা
আয়ুর্বেদ দর্পণ	অস্থি বিদ্যা	চানকের শ্রীনাথ রায়
ভৈষজ রত্নাবলী	চিকিৎসা	বর্ধমানের গোবিন্দ
ভাগবৎ	শল্য চিকিৎসা	কাঁচরাপাড়ার উমেশচন্দ্র
চরক	রোগ নির্ণয়	শান্তিপুরের শম্ভুচন্দ্র
চক্রদূত	পথ্য নির্ণয়	নদীয়ার চক্রদূতপাণি
হরিত	রোগ নির্ণয়	গুপ্তিপাড়ার নীলমণি
নিদান	রোগ নির্ণয়	মাধব
রসেন্দ্র চিন্তামণি	চিকিৎসা	ন্যায় সেরাই-এর গদাধর
রসরত্নাকর	চিকিৎসা	রামকৃষ্ণ
রসসাগর	চিকিৎসা	ঠাকুরদাস
সার কৌমুদী	ম্যাটেরিয়া মেডিকা	পেমার হরিমোহন
সুশ্রুত	অস্থিবিদ্যা	সোনার গাঙ্গের হরিশচন্দ্র
বিজয় রাখিত (Vijayrakhita)	চিকিৎসা, রোগনির্ণয়	বিজয়রাখিত

যে-সকল বিষয়ের মুদ্রণ নিয়ে ছাপাখানাগুলি বর্তমানে ব্যস্ত আছে তাদের মধ্যে কায়স্থদের পৈতা ধারণের অধিকার নিয়ে প্রায় এক বছর আগে যে-বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ফলে উভয় পক্ষে কায়স্থ দীপিকা, কায়স্থ-কৌরব ইত্যাদির মত ১২ থেকে ২০টি পুস্তক রচিত হয়েছিল। তিন খণ্ডে রচিত কায়স্থ-কৌরব গ্রন্থে রাজেন্দ্রলাল মিত্র কায়স্থদের মত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে পুরাণ ও পৌরাণিক পুথি-পত্র ঘেঁটে প্রচুর সাক্ষ্য উপস্থিত করেছেন। উক্ত গ্রন্থকার তাঁর মত প্রচারের জন্য 'কায়স্থ কিরণ' নামে একটি সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। হিন্দুদের কলম থেকে বর্ণপ্রথার বিরুদ্ধে বাংলায় কোন পুস্তক এখনও বের হয় নাই। একজন বৌদ্ধের দ্বারা কৃত একটি অনুবাদ এ-বিষয়ের একমাত্র ব্যতিক্রম।

দাবা খেলার বিষয়ে 'আকবোল চারত্র' নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে ১৮৫৭ সালে। 'সঙ্গীত তরঙ্গিনী' প্রকাশিত হয়েছিল এখন থেকে দশ বছর আগে। এ-পুস্তকে সঙ্গীত সম্পর্কে বিশদ ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। ভারতীয়রা যুগ যুগ ধরে সঙ্গীত-বিজ্ঞানের চর্চা করা সত্ত্বেও খুব অল্প সংখ্যক পণ্ডিতই এ-পুস্তকের বিষয় ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। আট বছর আগে একজন স্থানীয় লোক বাংলা ভাষায় সমগ্র এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার অনুবাদ আরম্ভ করেন। দশ খণ্ড প্রকাশ করার পর তিনি এ-কাজে ক্ষান্ত দেন। মি. এইচ. বেইলী (কভেনেন্টে সার্ভিসভুক্ত) সড়ক নির্মাণ ও পাথর দিয়ে সড়ক ঢালাই করার বিষয়ে, চিত্র সহকারে, মফস্বলবাসীদের জন্য ১৮৫৫ সালের 'উপায় দর্শক' বা 'স্মৃতিকথা' প্রকাশ করেন। এর পরই মামলা মকদ্দমার বিষয়ে আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই উভয় গ্রন্থেই বহুবিধ ব্যবহারিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মস্তিষ্ক-তত্ত্বের বিষয়ে একটি বই প্রকাশ করেছেন মস্তিষ্ক-তত্ত্ব সমিতির সভাপতি কালি-কুমার দাস। ১৮২৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'কর্মলোচন', শাস্ত্র-বিধি লংঘনের পাপ ও তজ্জনিত শাস্তি সম্পর্কিত গ্রন্থ। এগুলি ছাড়া আরও নানা প্রকার বই প্রকাশিত হয়েছে, যেগুলিকে নিছক সাহিত্যিক কৌতূহলের শ্রেণীতে ফেলা যায়। যেমন, ১৮২৫ সালে প্রকাশিত 'সাধু সন্তোষিণী'। গঙ্গাজল নিয়ে শপথ করা যে হিন্দু ধর্মমতে নিষিদ্ধ, এ-পুস্তকে সে-কথাই বলা হয়েছে। হোমার এবং মিলটনের রচনারও কিছু কিছু অংশ বাংলায় অনূদিত হয়েছে। তবে এ-সম্পর্কে আরও বিশদ আলোচনার জন্য এখানে নিতান্তই স্থানাভাব।

মুসলমানী বাংলা—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ২৪,৬০০ কপি

মুসলমানদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকই ইংরেজী স্কুলে পড়াশোনা করতে ইচ্ছুক। তারা স্যাক্সন জাতীয় লোকদের অনুকরণ করাও পছন্দ করে না। তাহলেও তাদের বেশ বুদ্ধি আছে এবং তারা প্রাচ্য দেশীয় বিষয়সমূহ অধ্যয়ন করতে ভালবাসে। তাদের যে মানসিক মৃত্যু হয়েছে তা নয়, তারা স্বপ্নাচ্ছন্ন মাত্র।[৪২] তাদের জন্য রুচিসম্মত পুস্তক প্রণয়ন করার উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। মুসলমানেরা বাংলা ভাষায়ই কথা বলে কিন্তু তাতে প্রচুর ফারসী ও উর্দু শব্দের মিশ্রণ থাকে।

মুসলমানী বাংলা নামে অভিহিত পুস্তকগুলি এই কাঠামোতেই রচিত। ভাষা বাংলা হলেও বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দসমূহ ফারসী। বস্তুতঃ এ হল ফারসী ও বাংলার মধ্যে একটা আপোষ রফা, যেমন ফারসী ও হিন্দীর মধ্যে আপোষ রফার ফল ছিল উর্দু ভাষা। তবে বাংলা আদালতের ভাষা ও বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায়, এই উপভাষা সম্ভবতঃ ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে যাবে। লর্ড কর্নওয়ালিসের সময়ে বাঙালী ভদ্রলোকেরা স্বদেশীয় ব্যাপারে সর্বদা ফারসীতেই পড়ালেখা করত। এসব পুথি প্রধানতঃ নৌকার

মাঝিরা (ভেনিসের গন্ডোলা চালকদের মতই এরাও সঙ্গীতপ্রিয়), মুসলমান ভৃত্য ও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই পাঠ করে। নিম্নে এ-শ্রেণীর পুস্তকের একটি তালিকা দেওয়া হল। এগুলি ফি-বছর প্রকাশিত এবং ব্যাপক হারে বিক্রিত হয়।

নাম	পৃষ্ঠা সংখ্যা	বিবরণ
আবু শামা	২৭	খলিফা ওমরের পুত্রের জীবনী
আজাবুল কবর	৬৪	কবরের আজাব সংক্রান্ত
আমির হামজা	৪৪৪	[হজরত] মুহম্মদের চাচার হত্যা-বিষয়ক
বাহার দানেশ	২০৬	স্ত্রীলোকদের ব্যঙ্গ করে হাস্যরসের গল্প
বৌমালা	৪৮	×
বেদারুল গাফেলীন	১৬৭	বে-খেয়ালদের সতর্কীকরণ সম্পর্কে
ভবলাভ স্রোত	১৯২	সঙ্গীতাদি
চাহার দরবেশ	২৮৮	চার দরবেশের কাহিনী
গোলেবকাওলি	২৮৮	প্রণয় কাহিনী
হজরতের তোয়াল্লাদ	২৫	[হজরত] মুহম্মদের জন্ম
হাজার মছলা	১০৮	ধর্ম বিষয়ে এক সহস্র প্রবাদ
হাতেমতা'য়ী	২৯৯	প্রখ্যাত আরব নেতার জীবন-চরিত
ইবলিস নামা	৭২	শয়তানের প্ররোচনা সম্পর্কে
ইসলাম জাতি	১০০	মুসলমানদের আচরণ সম্পর্কে
ঈমান চুরি	৩১	বে-ঈমানদের সম্পর্কে
জয়গুন	২৬২	জনৈকা মহিলাযোদ্ধার জীবন চরিত
কাজী হয়রান	৯২	কিংকর্তব্যবিমূঢ় হাকিম
কুঞ্জী বিহারী	২৮	গল্প
কেয়ামত নামা	১৮৮	শেষ বিচার দিনের বিষয়ে
লালমোন কেচ্ছা	২০	রাজকন্যার গল্প
মৌলুদ আদম	৮৬	আদম-জীবনী
মৌলুদ শরীফ	১৮৬	[হজরত] মুহম্মদের জন্ম
মুক্তাল হোছেন	২৭৬	হোসেনের মৃত্যু
মেফতাহুল জান্নাত	×	বেহেশতের চাবি
মেয়রাজ নামা	৬৪	[হজরত] মুহম্মদের বেহেশতে উত্তরণ
মোছা রায়বর	১৫	মুসার ইতিবৃত্ত
মুর্শিদ নামা	২৩	×
নিজামুল ইসলাম	৫২	ইসলামের বিধিবিধান
নুরেল ঈমান	৯৯	ভক্তি সম্পর্কে
ওফাত নামা	২৪	[হজরত] মুহম্মদের মৃত্যু

রদ্দে মনফেরা	১০৪	অবিশ্বাসীদের যুক্তি খণ্ডন
শাহনামা	৩০৪	পারশ্য সম্রাটের ইতিবৃত্ত
শুর্জ উজাল	৪০	নারী-যোদ্ধাদের বিবরণ
সিফাতা সেলাত	৪৭	প্রার্থনা-বিষয়ক
সাফয়াতুল মোমেমিন	১৪৪	মোমিনদের পরিত্রাণ-বিষয়ক
সোনাভান	৩৯	নারী-যোদ্ধার বিবরণ
তজবিজ একফিন	১১২	দাফন সম্পর্কিত
তমবিহুল জাহেলিন	১০২	পাষণ্ডদমন-বিষয়ক
তোতা ইতিহাস	১৩০	উপাখ্যান
তুমবিহুল গাফেলিন	×	অজ্ঞ লোকের শাস্তি-সম্পর্কিত
ইউসুফ জোলেখা	১২৬	জোসেফ ও জুলেখার প্রণয়-কাহিনী

বাইবেল সোসাইটি এই উপ-ভাষায় (মুসলমানী বাংলায়) লিউক-এর সুসমাচার (গসপেল অব লিউক) এবং ধর্মগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন অংশ মুদ্রিত করেছে। ট্রাক্ট সোসাইটিও এই উপ-ভাষায় অনেকগুলি ধর্ম-পুস্তক প্রকাশ করেছে।

পৌরাণিক ও হিন্দুধর্মীয় গ্রন্থ--বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ৯৬,১৫০ কপি

দুই-তিন শতাব্দী পূর্বে রচিত 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'চণ্ডী' ও 'গঙ্গাভক্তি' প্রচার-সংখ্যার দিক থেকে এখনও তাদের পূর্বাবস্থা বজায় রেখেছে এবং মুদ্রণ পারিপাট্যের দিক থেকে অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছে। এ-গ্রন্থগুলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায় পেশাদার আবৃত্তিকারীদের মুখের আবৃত্তি কিংবা পাঠ শুনলে। গ্রীকদের কাছে যেমন সমাদৃত ছিল হোমারের কাব্য, হিন্দুদের কাছেও 'রামায়ণ', 'মহাভারত' মহাকাব্যদ্বয়ের তেমনই সমাদর।

হিন্দুদের পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়েছে।[৪৩] সম্প্রতি হিন্দু যুবকদের নিকট তাদের ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন, লোকনাথ বসু প্রণীত 'হিন্দু ধর্ম-মর্ম', 'স্মৃতি তর্পন' বা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে হিন্দুর আচার-অনুষ্ঠান শিক্ষাদান, 'জ্ঞান চন্দ্রাংশু' বা তন্ত্র, মনু ও উপনিষদ সম্পর্কে ১৮টি প্রশ্নের সহজ উত্তর। খ্রীস্টান ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে জামাত (এসেম্বলী) ও গীর্জার প্রশ্নোত্তরমালার মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি যে কাজ করে সেরূপ কার্য-অভিপ্রায়েই এই গ্রন্থগুলি রচিত।

হিন্দুদের শৈব ও বৈষ্ণব মতের ব্যাখ্যামূলক অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও তান্ত্রিক মত সম্পর্কে সংস্কৃত কিংবা বাংলা ভাষায় বিশেষ কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই। 'স্ত্রীকুহলাখন দীপিকা'-র মত প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে তান্ত্রিক শাস্ত্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, যদিও সেগুলি প্রায় সবই অশালীন বিষয়সম্পর্কিত।

প্রকৃতি বিজ্ঞান----বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ২,৫০ কপি

এ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল জ্যোতিবিদ্যা সংক্রান্ত তিনটি, যন্ত্র বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি, প্রাকৃত দর্শন সম্পর্কে দুইটি, উদ্ভিদবিদ্যা-বিষয়ক দুইটি, প্রাণীবিদ্যা-বিষয়ক একটি, শরীরবিদ্যা-বিষয়ক একটি এবং প্রাকৃত ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি সন্দর্ভ পুস্তক।

এই বইগুলি পঠন-পাঠনের দরুণ যে ফল পাওয়া গিয়েছে তাতে এ-কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে নিজেদের দেশজ ভাষার পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে বিজ্ঞান-চর্চাকে অনেক সহজে জনপ্রিয় করে তোলা সম্ভব। ইরেজী ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়ান হলে, ইংরেজী ভাষায় এদেশীয় লোকেরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নয় বলে, তাদের পক্ষে শব্দের শাঁস গ্রহণ করার আগে শব্দের বাহ্য খোসা ভেদ করতেই অর্ধেক সময় কেটে যায়। বাংলা পুস্তকগুলিতে যে-সব নাম বা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হয় সেগুলি স্বব্যাখ্যাত। জার্মান, সংস্কৃত হিব্রু এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন ভাষার মত বাংলা ভাষার নামপদগুলিও সংশ্লিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের গুণাগুণ দ্যোতনা করে।

উপরোক্ত বিজ্ঞানের পুস্তকগুলি থেকে নিম্নে এ-বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল:

বৈজ্ঞানিক নাম	বাংলা নাম	বাংলা নামের অর্থ
Diaphoretic	স্বেদকারক	ঘর্ম নিঃসারক
Narcotics	নিদ্রাকারক	ঘুম পাড়ানিয়া
Tonics	বলকারক	শক্তিদায়ক
Authelminties	ক্রিমি নাশক	ক্রিমি ধ্বংসকারী
Crytogamous	অব্যক্ত পুষ্পক	যে-ফুল দেখা যায় না
Avalawch	নিহার স্ফুট	বরফের প্রবাহ
Fossil bone	অস্থিভূত প্রস্তর	পাথরে পরিণত হাড়
Cyclone	বাতবর্ত	বৃত্তাকার বায়ু-প্রবাহ
Plwviometer	বৃষ্টি মাপক যন্ত্র	বৃষ্টি পরিমাপক
Palozioc Age	মৎস যুগ	মাছের যুগ
Leguminous	সিম-ধর্মিক	শিমগাছ
Pachydermata	স্থূলচর্ম	মোটা চামড়া যুক্ত

ভারতবর্ষের তাবৎ ভাষার, এমনকি তামিল-তেলেগুর মত যে-সকল ভাষা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয় সে-সব ভাষারও ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দসমূহ সংস্কৃত ভাষা থেকে গৃহীত।[৪৪] জার্মান ভাষার মত সংস্কৃত ভাষারও এমন একটি বিশেষ গুণ আছে যার দরুণ নিজ ভাষায় স্বব্যাখ্যাকৃত শব্দ সৃষ্টি করা ছাড়াও সংস্কৃত তার স্বকীয় অন্যান্য ভাষাসমূহের ভিতরেও শব্দ সৃষ্টির সে-গুণটি সঞ্চারিত করে দিতে পারে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে যৎসামান্য ইংরেজী শিখতে এদেশীয় লোকদের যে সময় ব্যয়

হয় সেই সময়ের মধ্যে তারা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি অনেক সহজে আয়ত্ত করতে পারে। অবশ্য এ-সময়ে তারা ইংরেজীও পড়তে পারে ভাষা শিক্ষার জন্যে, ইংরেজরা যেমন ভাষা শিক্ষার জন্যে পড়ে ফরাসী ভাষা। এই পদ্ধতিতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহে বেশ সাফল্য লাভ করা গিয়েছে। জনশিক্ষা পরিচালক কর্তৃক নিয়োজিত 'কমিটি ফর ডেভলাপমেণ্ট অব স্কুল্স্' বঙ্গদেশেও এই পদ্ধতি কার্যকরী করার জন্যে জোর সুপারিশ করেছে।

সংবাদপত্র—বিক্রয়ের জন্যে মুদ্রিত ২,৯৫০ কপি

অন্যান্য প্রকাশিত পুস্তকের সঙ্গে তুলনায় সংবাদপত্রগুলির প্রচার সংখ্যা কম।[৪৫] কিন্তু জনসমাজে তাদের প্রভাব খুব বেশী। প্রতিটি পত্রিকার জন্য গড়ে দশজন পাঠক হিসেবে ধরে নিলেও মোট পাঠকের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৩০,০০০। তাছাড়া, মফস্বলের অসংখ্য লোককে পত্রিকাগুলি সরকারের কার্যক্রম সম্বন্ধে তাদের নিজস্ব মতামত জানাতে পারে। ইংরেজী খবরের কাগজ থেকে অনুবাদ করার নিমিত্ত সম্পাদকেরা এদেশীয় লোক নিযুক্ত রাখেন। ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদকেরা স্থানীয় লোকদের সম্পর্কে যে অকৃপণ নিন্দাবাদ বর্ষণ করেন অনুবাদকদের মাধ্যমে সম্পাদকেরা তা জ্ঞাত হন। ফলে ইউরোপীয়দের প্রতি শত্রুতার ভাব জেগে উঠে। আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করেছি যে ইংরেজী খবরের কাগজের বাঙালী পাঠকদের মধ্যে ইউরোপীয়দের সম্পর্কে একটি অসহিষ্ণুতার মনোভাব রয়েছে। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যেও এ-মনোভাব আছে। তবে তা ভিন্ন মাত্রায়। ইংরেজী সংবাদপত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতিগত বৈরীভাব পোষণ করে। অথচ পাঞ্জাবের যুদ্ধ এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে এ-দেশীয় পত্রিকাগুলি তাদের প্রাচ্য দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মোটামুটি ভাবে নরম সুর বজায় রেখেছিল। পক্ষান্তরে উর্দু ও ফারসী পত্রিকাগুলির মেজাজ ছিল অন্যরকম।

প্রচলিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ১৮২০ সালে সহমরণ প্রথা ও সনাতন হিন্দুধর্মের প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত 'চন্দ্রিকা' হল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্ম-বিষয়ক বলিষ্ঠ প্রবন্ধগুলিই রামমোহন রায়কে সংবাদপত্র জগতে নিয়ে আসে এবং তিনি ১৮১৯ সালে সংস্কারের একনিষ্ঠ প্রবক্তারূপে 'কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'চন্দ্রিকা' ছিল 'ধর্মসভা'-র মুখপত্র। এ-সভার প্রধান ছিলেন ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বাংলা ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি এ-পত্রিকা সম্পাদনা করেন। 'চন্দ্রিকা' মাঝে মাঝে ঘেউ ঘেউ করে বটে তবে এখন সে দন্তহীন। তার তুলনায় হিন্দু সংস্কারপন্থীরা এখন অনেক বেশী শক্তিশালী।[৪৬]

বয়সের দিক থেকে প্রচলিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে 'চন্দ্রিকা'র পরেই ১৮৩০ সালে প্রকাশিত দৈনিক 'প্রভাকর'-এর স্থান। এ-পত্রিকা তার সাহিত্যিক রচনাসমূহের উৎকর্ষ, ভাষা-রীতির সুষমা এবং বুদ্ধিদীপ্ত রস-রসিকতার, বিশেষতঃ পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বাংলা সাহিত্যের দক্ষ ও প্রখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

কর্তৃক রচিত পদ্যের জন্য বিশিষ্টতা লাভ করেছিল। পত্রিকার প্রচারসংখ্যা বৃদ্ধির মূলেও ছিল এই পদ্য। এই পত্রিকার গোড়ার দিকের সংখ্যাগুলি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে প্রভাকরের পদ্য এত চমৎকার ও বাঙ্গালীদের কাছে এতই উপাদেয় ছিল যে তারা এ-কবিতা ছাড়া আর কিছুই পাঠ করতে পছন্দ করত না। এ-পত্রিকার সম্পাদক স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে 'দর্পণ' সম্পাদকের সঙ্গে এক বাদানুবাদে লিপ্ত হয়ে মন্তব্য করেন যে প্রভাকরের প্রচণ্ড প্রভায় প্রাচীন দর্পণের পেটে আগুন জ্বলে উঠে স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থনে পত্রিকার তুলাসদৃশ যুক্তির স্তূপকে তা ভস্মা করে দিয়েছে।

বর্তমানে প্রচারিত 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' ও 'ভাস্কর' নামে দুটি পত্রিকার আবির্ভাব ঘটেছে ১৮৩৮ সালে। দুটি পত্রিকাই অদ্যাবধি স্থানীয় জনসাধারণের মুখপাত্র হিসেবে তাদের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে। 'পূর্ণচন্দ্রোদয়' একটি দৈনিক পত্রিকা হলেও রাজনৈতিক মতামতের সুতীব্র আবর্তে কখনো নিজকে জড়ায় না। এ-পত্রিকায় কেবল বিবিধ বিষয়ে সংবাদ এবং সাহিত্যিক রচনা প্রকাশিত হয়।[৪৭]

ত্রি-সাপ্তাহিক 'ভাস্কর' কলকাতাবাসীদের পত্রিকা বলেই পরিচিত। এ-পত্রিকা সকল সময়ে, বিশেষতঃ এর প্রথম সম্পাদক শ্রীনাথ রায়ের সময়ে, মানুষ ও অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে এমন নির্ভীক মতামত প্রকাশ করেছে যে এর কষাঘাতে অনেককেই ছটফট করতে হয়েছে। ভাস্করের গ্রাহক আছে পাঞ্জাবেও। এমনকি ইংল্যান্ডবাসী যে-সকল ইউরোপীয় কলকাতার পত্র-পত্রিকার খবর রাখেন তারাও এ-পত্রিকার গ্রাহকদের মধ্যে আছেন। ভাস্করের বর্ষপরিক্রমায় ১৮৪০ একটি স্মরণীয় বছর। দু'জন ব্রাহ্মণকে ধর্মসভা থেকে বহিষ্কার এবং একজন ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব সমাজে বিয়ে করতে বাধ্য করায় সে-বছর আন্দোলের জমিদারকে সম্পাদক তাঁর মর্মঘাতী লেখনী দ্বারা তীব্র আঘাত করেন। রাজা বাহাদুর সম্পাদককে এমবুশ করে লাঠি-পেটা করেন এবং আন্দোলে নিয়ে গিয়ে দিবালোকের প্রবেশাধিকারহীন একটি স্যাঁতসেঁতে ঘরে আটক রাখেন। তিনি যে-হাত দিয়ে রাজার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেছিলেন শাস্তিস্বরূপ সে-হাতটি নোড়া দিয়ে গুড়ো করে দেওয়া হয়।[৪৮] সম্পাদক সেখান থেকে পালিয়ে এসে সুপ্রিম কোর্টে রাজার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। বিচারে রাজার ১০০০ টাকা জরিমানা হয়। পত্রিকা পূর্ববৎ চালু থাকে। সম্পাদক এ-কাজে এতই সাফল্য লাভ করেন যে তিনি ১৮৪৮ সালে এক বিরাট সান্ধ্য সম্মেলনের আয়োজন করেন এবং 'ভাস্করের জন্য দিনটিতে অতিথিদের দুধ, দই, ক্ষীর ও ছানা দ্বারা ভুরি-ভোজে এবং ব্রাহ্মণদের নগদ টাকা দিয়ে আপ্যায়িত করেন'।

১৮৪৮ সালে 'বেঙ্গলী গভর্নমেণ্ট গেজেট' নামে একটি সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। সরকারের কার্যক্রমের সঙ্গে এদেশীয় লোকদের ঘনিষ্ট পরিচয় ঘটাবার ক্ষেত্রে পত্রিকাটির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এ-পত্রিকায় আইন সভায় গৃহীত আইন, সদর দেওয়ানী বিধান ও আদেশাবলী, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি প্রকাশিত হত। এ-পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছে 'দর্পণ'-এর প্রাক্তন সম্পাদককে যিনি ইংরেজী-না-জানা বাঙালীদের যাবতীয়

খবরাখবর থেকে বঞ্চিত রাখা নীতির দীর্ঘকাল যাবৎ বিরোধিতা করে এসেছেন। এ-পত্রিকাটি বহুল প্রচারিত। সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এর বিশেষ অবদান রয়েছে।

বর্তমানে লুপ্ত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে 'শ্রীরামপুর দর্পণ'-এর স্থান সর্বোচ্চে। এ-পত্রিকা ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সাল পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণে নিত্য প্রয়োজনীয় খবরাদি বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলার ৬০টি কেন্দ্রে পৌঁছে দিয়েছে।[৪৯] মার্কুইস অব হেস্টিংস এবং সরকারের অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তাগণ পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষকতা করে যথেষ্ট প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছিলেন।[৫০] সম্পাদক জে. সি. মার্শম্যান এ-পত্রিকাটিকে রাজনৈতিক বিষয়ে সঠিক সংবাদ পরিবেশনের একটি সুন্দর মাধ্যমে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাছাড়া, এ-দেশীয় লোকদের স্থানীয় অভাব-অভিযোগ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার জন্যেও পত্রিকাটি একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিল। বস্তুতঃ এ-পত্রিকা ছিল দূরতম জেলাগুলিতে প্রশাসনিক দুর্নীতির ক্ষেত্রে এক বাধা-স্বরূপ।

রামমোহন রায় পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও জাগ্রত মনের অধিকারী ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দুধর্মের সংস্কারের জন্য বক্তৃতার চেয়ে সংবাদপত্রই অধিকতর শক্তিশালী মাধ্যম। সে-জন্যেই তিনি সতীদাহ ও বর্ণপ্রথার অন্ধ-সমর্থক 'চন্দ্রিকা'র বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে ১৮১৯ সালে 'কৌমুদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত 'কৌমুদী'র প্রকাশ অব্যাহত ছিল। সতীদাহ প্রথা বিলোপের পক্ষে মনোভাব গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবন্ধাদি রচনা এবং শেষ পর্যন্ত তা কার্যকরী করার ক্ষেত্রে 'কৌমুদী'র অবদান মোটেই নগণ্য ছিল না। ১৮২২ সালে 'তিমির নাশক' ও 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হয়। বঙ্গদূতের সম্পাদক ছিলেন সল্ট বোর্ডের দেওয়ান সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত নীলরত্ন হালদার (নীলরতন হালদার)। পত্রিকাটি ১৭ বছর টিকে ছিল। ১৮৩০ সালে প্রকাশিত হয় 'সুধাকর' ও 'অনুবাদিকা'[৫১]। অতঃপর ১৮৩১ সালে প্রকাশিত হয় 'সুখকর', 'রত্নাকর' ও 'সভারাজেন্দ্র'। শেষোক্ত পত্রিকাটি যুগপৎ ফারসী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হত; সম্পাদক ছিলেন একজন মৌলবী। পরবর্তী ১৩ বছর যাবৎ যে-পত্রিকাটি হিন্দু সমাজের জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে তা হল 'জ্ঞানান্বেষণ'। এর সম্পাদক ছিল হিন্দু কলেজের দু'জন প্রাক্তন ছাত্র। বাংলা ভাষা ও কৃষি-শিক্ষা এবং বাংলা ভাষাকে আদালতের ভাষার মর্যাদা দানের বিষয়ে এ-পত্রিকা ছিল একনিষ্ঠ প্রবক্তা। হিন্দুদের মধ্যে বিদ্যমান নানা প্রকার সামাজিক দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হত এর চিঠিপত্র স্তম্ভে। এ-সমস্ত দোষ-ত্রুটির মধ্যে ছিল বারোয়ারী পূজা, দেশীয় ডাক্তারদের বজ্জাতি—ঔষধের জন্যে হাজার গুণ বেশী দাম দাবী করা, ধর্মীয় কুসংস্কারের দরুন গরুর হাড়ের সাহায্যে পরিষ্কৃত চিনি না খাওয়া ইত্যাদি।

১৮৩২ থেকে ১৮৩৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'রত্নাবলী', 'সার সংগ্রহ', 'সুধা সিন্ধু', 'দিবাকর', 'গুণাকর সৌদামিনী', 'মৃত্যুঞ্জয়' ও 'সত্যবাদী'। রত্নাবলী' পত্রিকার

আবির্ভাব ঘটেছিল সতীদাহের অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। এ-সম্পর্কে বিলাতে রাজার কাছে এদেশীয় লোকদের আবেদন নাকচ হয়ে যাওয়ায় পত্রিকাটি মন্তব্য করেছিল, "আমাদের সরকারের দায়িত্বভার রাজা বহন করেন না ; প্রজারাই নিজেদের মধ্য থেকে রাজা তৈরী করে, যেমন নাকি বঙ্গদেশে ঘট স্থাপন করে লোকেরা তাকে পূজা করে।" সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে আইন পাশ হওয়ার পরও ছয়-সাতটি সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল কিন্তু সতীদাহ করার উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনতিবিলম্বেই ভাটা পড়ে এবং জন-সাধারণের এই তথাকথিত মুখপত্রগুলিও তিরোহিত হয়।[৫২] 'মৃত্যুঞ্জয়' নামক সংবাদপত্রটি প্রায় আদ্যন্ত পদ্যে প্রকাশিত হত।

'রসরাজ' প্রকাশিত হয় ১৮৩৮ সালে। গোড়ায় পত্রিকাটি মৌলিক ছন্দোবদ্ধ রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। কিন্তু পত্রিকাটি কলকাতার সাপ্তাহিক সংবাদে পরিণত হয় এবং কদর্য মন্তব্য, ব্যক্তিগত কলহ-কোন্দল ও খিস্তি-খারাবীর আধারে রূপান্তরিত হয়ে কলকাতার অভ্র-সমাজের নিস্তরঙ্গ জীবন-প্রবাহে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৮৪০ সালে এই পত্রিকা সম্পর্কে সমসাময়িক অপর একটি পত্রিকা মন্তব্য করেছিল, "আমাদের অতিশয় কোমল অনুভূতিগুলিকে আহত করে এর সম্পাদক আনন্দ পান। তার কল্পিত ন্যায় ও কর্তব্যবোধের পথে মানুষকে বলপ্রয়োগের দ্বারা পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত অশালীন ভাষার আশ্রয় নেন।" বিশেষ কোন দলের পক্ষে ক্ষতিকর লেখা প্রকাশ করা থেকে পত্রিকাটিকে বিরত রাখার জন্যে "মুখ-বন্ধকারী সেলামী" হিসেবে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দেওয়ার কথা আমরা শুনেছি। ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত পত্রিকাটি জীবিত ছিল।

১৮৩৯ সালে জমিদার জগনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন "অরুণোদয়"। 'রসরাজের' আক্রমণ থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সুজন রঞ্জন'। তাছাড়া প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদূত' নামে একটি উদারপন্থী পত্রিকা। উল্লেখ্য যে 'বঙ্গদূত'ই একমাত্র এদেশীয় পত্রিকা যা রবিবারে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪০ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত কিন্তু অধুনালুপ্ত পত্রিকাসমূহের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশ	মন্তব্য
মুর্শিদাবাদ পত্রিকা	১৮৪০	প্রজাদের অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বহরমপুরের রাজা কর্তৃক প্রকাশিত
জ্ঞানদীপিকা	১৮৪০	সাধারণ সংবাদ সম্পাদক ভগবৎ চরণ
ভারতবন্ধু	১৮৪১	শ্যামচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশ	মন্তব্য
বাংলা স্পেক্টেটর	১৮৪২	ইংরেজী-বাংলায় ৫৩; সংস্কারের প্রবক্তারূপে আর. জি. ঘোষ ও টি. সি. মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত
ভঙ্গ দূত	১৮৪২	নীলকমল দাস সম্পাদিত
রাজরাণী	১৮৪৪	গঙ্গানারায়ণ বসু সম্পাদিত
সর্বরস-রঙ্গিনী	১৮৪৪	×
জগত দীপ	১৮৪৬	মৌলবী বুজেরালী সম্পাদিত; ফারসী, হিন্দী, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায়
মার্তণ্ড	১৮৪৬	পঞ্চবাষিক; উর্দু, ইংরেজী, বাংলা, ফারসী, হিন্দী ও শোন ভাষায়; কেবল এক মাসের জন্য
জ্ঞানদর্পণ	১৮৪৭	উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; তিন বছর প্রকাশিত
সুজনবন্ধু	১৮৪৭	নবীনচন্দ্র দে সম্পাদিত
জ্ঞানার্জন	১৮৪৭	চৈতন্যচরণ অধিকারী সম্পাদিত
কাব্যরত্নাকার	১৮৪৭	উমাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত; ব্যঙ্গাত্মক, 'পাঞ্চা' পত্রিকার অনুরূপ
দিগ্‌বিজয়	১৮৪৭	দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত
আক্কেল গুরুম	১৮৪৭	ব্রজনাথ সম্পাদিত; 'ভাস্কর' পত্রিকার বিপক্ষে 'প্রভাকর' পত্রিকার সমর্থক
মনোরঞ্জন	১৮৪৭	গোপালচন্দ্র দে সম্পাদিত
রঙ্গপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুরুচরণ রায় সম্পাদিত
কৌস্তভ	১৮৪৮	মহেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশ	মন্তব্য
মুক্তাবলী	১৮৪৮	কালিকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত
রসমুদগর	১৮৪৮	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
রত্নবর্ষণ	১৮৪৮	মাধবচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত
দিনমণি	১৮৪৮	গোপালচন্দ্র দে সম্পাদিত, ব্যঙ্গাত্মক
অরুণোদয়	১৮৪৮	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
জ্ঞান রত্নাকর	১৮৪৮	তরীচরণ রায় সম্পাদিত
জ্ঞান চন্দ্রোদয়	১৮৪৮	রাধানাথ বসু
রস সাগর	১৮৪৮	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ভৃঙ্গদূত	১৮৪৮	×
রস মুদগর	১৮৪৯	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ; 'চন্দ্রিকা' পত্রিকার সমর্থক[৫৪] 'রসরাজ' পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী ; রসরাজ অন্যান্য পত্রিকার প্রতি কটূক্তি করে বলে তার উপর খড়্গহস্ত
মহাজন দর্শন	১৮৪৯	কালি বসু সম্পাদিত, ব্যবসা-বাণিজ্য-বিষয়ক পত্রিকা
রস রত্নাকর	১৮৪৯	যদুনাথ পাল সম্পাদিত
সুজন রঞ্জন	১৮৪৯	গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত
সুজন বন্ধু	১৮৪৯	নবীনচন্দ্র দে সম্পাদিত
জ্ঞান প্রদায়িনী	১৮৪৯	বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
সর্ব শুভঙ্করী	১৮৫০	মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
সত্য প্রদীপ	১৮৫০	এম. টাউনসেন্ড সম্পাদিত ; সাহিত্যিক রচনা ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সহকারে সংবাদের সংক্ষিপ্তসার পরিবেশক ; সচিত্র সাপ্তাহিক।[৫৫]

পল্লী-জীবনের জড়ত্ব, অথবা স্থানীয় স্বার্থপরতার স্থবিরত্ব থেকে বাঙালী-মানসকে জাগাবার প্রয়োজনীয়তা কিংবা হিন্দু ও ইউরোপীয়দের মধ্যে জ্ঞানার্জনের জন্যে আগ্রহের দিকে নজর দিলেই বুঝা যাবে যে এদেশীয় সংবাদপত্র ও ছাপাখানাগুলির গুরুত্ব কত অপরিসীম। কোন ইউরোপীয় যদি এই পত্রিকাগুলি একবার পড়েন তাহলে তিনি শুধু কলকাতার বাবু-সমাজেরই নয়, সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারবেন, তিনি দেখতে পাবেন এ-সমস্ত কাগজের ভিতরে দারোগা ও আমলাদের উৎপীড়নের পূর্ণ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। রাস্তা-ঘাটের অভাবের কথা রয়েছে। আর রয়েছে তরুণ ইউরোপীয় অফিসার ও আদালতের লোকজনের অদ্ভুত প্রতারণার কাহিনী, ১১ বছর যাবৎ ছেঁড়া নেকড়ার পুটুলী (যার ভিতরে পবিত্র কোরান শরীফ রয়েছে বলে লোকের ধারণা ছিল) ছুঁয়ে শপথ করার কথা।

বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সময় দেখা গিয়েছে যে সরকার ও সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে কত আজগুবী সংবাদই না এদেশীয় লোকদের মধ্যে প্রচারিত হতে পারে। নানা সাহেবের মত একজন শিক্ষিত লোকও যে কতদূর বানোয়াট কথায় পরিপূর্ণ একটি ঘোষণা-পত্র রচনা করতে পারেন তাও দেখা গিয়েছে। সরকার যদি গ্রামে গ্রামে সঠিক সংবাদ প্রচার করতে চান তাহলে তাকে অবশ্যই এদেশীয় সংবাদপত্রগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। ইংরেজ সরকারের দুশমনেরা নিষ্ক্রিয় বসে নেই। ইতিমধ্যেই এমন ধারণা প্রসার লাভ করছে যে ইংরেজ শক্তি এখন অস্তাচলগামী, শীঘ্রই রাশিয়ানরা ভারত-বর্ষে আসবে এবং ইংরেজদের চেয়েও সুচারুরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করবে।

এদেশীয় সংবাদপত্রগুলির চেহারায় বিনয়ের ছাপ থাকলেও যে-কাজে সরকারী আইন ব্যর্থ হয় সে-কাজেও এগুলি, জাতীয় গাথা-কাব্যগুলির মতই, মোক্ষম কার্যকরী। এরা স্রোতে ভাসমান খড়-কুটার ন্যায় স্রোতের গতি নির্দেশ করে। এদের পৃষ্ঠায় সতীদাহ, বর্ণপ্রথা, বিধবা-বিবাহ, কুলীন-সমাজে বহু-বিবাহের রীতি ইত্যাদি বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্মতাপূর্ণ বিতর্ক প্রকাশিত হয়েছে; এরা চিরকালই একটি বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষারূপে গ্রহণের বিরোধিতা করেছে[৫৬] এবং নীলকরদের অত্যাচার ও তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটদের ভুল-ভ্রান্তি তুলে ধরেছে। অপরদিকে চিঠি-পত্রের স্তম্ভে এদেশীয় জনসাধারণের যে-সকল অভিমত প্রকাশিত হয়েছে অন্যত্র তার দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে বিলাতে সংঘটিত অপরাধসমূহের বিবরণ থেকে টুকিটাকি সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে এটুকু দেখাবার উদ্দেশ্যে যে, ইংরেজ-সমাজেও দোষ-ত্রুটির অভাব নেই। নীতি-কাহিনী প্রায়ই প্রকাশিত হয়েছে। 'ভাস্কর'-এর স্তম্ভগুলিতে যে নীতি-কাহিনীমালা প্রকাশিত হয়েছিল, তাই পরে "জ্ঞান-প্রদীপ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলি কাব্য-লক্ষ্মীকেও ভুলে নাই। ঋতু-পরিক্রমা এবং প্রকৃতির বিচিত্র সম্ভার ও বর্ণসমারোহ সম্পর্কে অনেক ছোট কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এদের অনেকগুলিই কাব্যিকগুণ-সম্পন্ন ছিল। 'প্রভাকর'-এ বাংলার সব চেয়ে শক্তিমান কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি এদেশীয়

সংবাদপত্রের সঙ্গে একজন করে ইংরেজী-জানা লোক নিযুক্ত থাকত। তাই পত্রিকা-গুলিতে ইতিহাস, জীবন-চরিত, প্রাকৃত দর্শন, নীতিতত্ত্ব-বিষয়ক মূল্যবান ইংরেজী রচনার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৫৭] এসব পত্রিকার কোন কোনটির নিজস্ব সংবাদদাতা আছে। কাবুল ও পাঞ্জাবের যুদ্ধের সময়ে পত্রিকাগুলিতে ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নিয়মিত-ভাবে সঠিক তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে। অপরদিকে এসব পত্রিকায় লন্ডনের খুন-খারাবীর সংবাদ থেকে আরম্ভ করে মারাঠা পরিখার সর্বশেষ অবস্থার খবরও প্রকাশিত হয়েছে।

মফস্বল এলাকায় যে বাংলা পত্রিকা নেই তা নয়। ১৮৪৬ সালে বেনারসে পর্যন্ত বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। বেনারসের বাঙালী অধিবাসীরা আলাদাভাবে শহরের এক অংশে বাস করে, বাংলায় কথাবার্তা বলে এবং বাংলা বইপত্র পড়ে। সেখানে দুই-একটি বাংলা ছাপাখানাও আছে। এই সব কারণে বেনারসের কোন কোন বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষাও পড়ান হয়।[৫৮] 'বেনারস চন্দ্রোদয়' ও 'কাশীবার্তা প্রকাশিকা'—এ দু'টি পত্রিকা বেনারস-প্রবাসী বাঙালীদের মুখপত্র। বহরমপুরের রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় একদা মুর্শিদাবাদ থেকে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। প্রজাদের এ-পত্রিকার মাধ্যমে জ্ঞানালোক দান করার ইচ্ছা ছিল রাজা বাহাদুরের। রঙ্গপুর থেকে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' নামে একটি পত্রিকা কয়েক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি ছিল স্ত্রী-শিক্ষার সমর্থক। জেলার জনৈক উদার-হৃদয় জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় এর মূল ব্যয় নির্বাহ হত। বর্ধমান থেকে প্রকাশিত হত দুটি পত্রিকা—'বর্ধমান চন্দ্রোদয়' ও 'সংবাদ বর্ধমান'। পত্রিকা দুটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা।[৫৯] ১৮৫১-৫২ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. এইচ. ভি. সেলীর (Mr. H.V. Seyley) সম্পাদনায় 'মেদিনীপুর অধ্যক্ষ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। হুগলী শহরে একটি ছাপাখানা বেশ কয়েক বছর যাবৎ চালু থাকলেও সেখান থেকে কোন পত্রিকা প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বে ডাক-মাশুলের চড়া হার মফস্বল থেকে পত্রিকা প্রকাশের পথে এক বিরাট অন্তরায় ছিল।

সাময়িক-পত্র—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ৮,০০০ কপি

বর্তমানে প্রচলিত সাময়িক-পত্রগুলির মধ্যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' হল সব চেয়ে প্রাচীন। এ-পত্রিকার মাসিক প্রচার সংখ্যা ৮০০। সম্পাদকের দক্ষতা ও সাহিত্যিক রচনাগুলির গবেষণাগত গুণের জন্য পত্রিকাটি বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। এ-পত্রিকা তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র বিধায় এর পৃষ্ঠায় বৈদিক গ্রন্থসমূহের বহুবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৪৩ সালে এ-পত্রিকার জন্মালগ্ন থেকেই এর স্তম্ভসমূহ শরীরবিদ্যা, প্রাকৃত দর্শন, প্রাকৃতিক ইতিহাস, জীবন-চরিত ও হিন্দুদের বিভিন্ন সম্প্রদায়-সম্পর্কিত রচনাসমূহ স্থান পেয়েছে। এ-সব রচনার অনেকগুলি আবার চারুপাঠ গ্রন্থে পুর্নমুদ্রিত হয়েছে। 'সত্য সঞ্চারিণী' পত্রিকা নামে আরও একটি সাময়িক পত্রিকা বেদান্ত প্রচারে রত আছে। এ-পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে সভার মুখপত্ররূপে ১৮৫৬ সালে।

এ-সব সাময়িক পত্রের বিপক্ষে আছে 'চন্দ্রিকা'-র মানস-কন্যা 'নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা'। ১৮৫১ সাল থেকে পত্রিকাটি পৌত্তলিকতার রূপকে উৎসর্গীকৃত। সম্পাদক তার মতের স্বপক্ষে সিজারের মতো অমিতবলে রাজ্যের যাবতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার এনে উপস্থিত করেছেন। অপরদিকে 'মাসিক পত্রিকা' ধর্মীয় কোন্দল পরিহার করে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে সামাজিক সমস্যাগুলির উপর এবং উপাখ্যান, জীবনী, ইতিবৃত্ত ইত্যাদির মাধ্যমে সংস্কারের স্বপক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। পত্রিকাটির রচনা-রীতি সহজ সরল। স্বদেশবাসীর নৈতিক উন্নতির জন্য পত্রিকা সম্পাদক রাধানাথ শিকদারের উদ্যম অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

১৮৫১ সালে ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একটি বাংলা পেনি ম্যাগাজিন প্রকাশনা আরম্ভ করে। এই মাসিক পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল। পত্রিকায় বিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে ধাতুর পাতের সাহায্যে মুদ্রিত চিত্রও প্রকাশ করা হয়। সোসাইটি সরকারের কাছ থেকে মাসিক ১৫০ টাকা হারে যে অর্থ সাহায্য পায় তা থেকে মাসিক ৮০ টাকা এই পত্রিকার সাহায্যার্থে প্রদান করা হয়। তাছাড়া, মফস্বলে পত্রিকা পাঠাবার জন্য প্রয়োজনীয় ডাকমাশুলও এই সোসাইটিই বহন করে। বঙ্গদেশের অভ্যন্তরে বাংলা বই-পত্র পাঠাবার ব্যাপারে ডাকমাশুল এক মস্ত বড় অন্তরায়। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সম্পর্কে সর্বশেষ রিপোর্ট হল: "গেল বছরের গোলযোগের দরুন তাদের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির গ্রাহকবর্গকে হারাতে হয়েছে। এই গ্রাহকদের সংখ্যা ঊর্ধ্বে ১০০ হবে। পত্রিকা প্রচার এখন বঙ্গদেশ ও বিহারের জেলাগুলির মধ্যেই সীমিত আছে। প্রতি মাসে 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র প্রায় ৭০০ কপি প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে প্রায় ৩৫০ কপি ক্রয় করে মফস্বলের ক্ষুদ্র জমিদার, আদালতের আমলা এবং বাংলা ও অন্যান্য স্কুলের শিক্ষকগণ। এ-শ্রেণীর লোকেরা পত্রিকার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত। তারা পত্রিকার চাঁদা সাধারণতঃ ডাক-টিকিটের দ্বারা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে। ইতিপূর্বে প্রকাশিত সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু বিভিন্ন শাখায় বিন্যাস করা যেতে পারে—যেমন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্য তৈরী-করণ, আঞ্চলিক ও পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবন-চরিত, আচার-ব্যবহার, বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের অবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ, প্রাকৃতিক ইতিহাস, শরীর বিদ্যা, নীতি-কাহিনী ও বিবিধ সংকলন। রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঠকদের মতামত গ্রহণ করা হয় এবং পাঠকদের ইচ্ছা অনুসারেই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্যাদি তৈরিকরণ এবং নৃতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক বেশী সংখ্যক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত শাখায় ছিল সাবান, কর্পূর, মোমবাতি, সুগন্ধি ও চিনি তৈরি সংক্রান্ত প্রবন্ধসমূহ। দ্বিতীয় শাখায় অন্তর্ভুক্ত ছিল নীলগিরির টোডা জাতি, ব্রাজিলের অধিবাসী ও এস্কিমো-ভারতীয় টেরাডেল ফিউগো ও বেচুয়ানার আদিম অধিবাসিগণ, কোরানা হটেণ্টট, সিরকামিয়া ও জাভার অধিবাসী এবং বেদুঈনদের বিবরণ। অন্যান্য শাখায় প্রকাশিত হয়েছিল বহু রচনা যাদের উদ্দেশ্য ছিল দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সে-সব বিষয়ে জ্ঞান দান করা যে-সব বিষয়ের জ্ঞান কেবল ইংরেজ পণ্ডিতদের একচেটিয়া ছিল।"

'কৃষি সংগ্রহ' হল কৃষি-উদ্যান সমিতির মুখপত্র। এর প্রথম সংখ্যাতেই অন্যূন ৩৬টি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ ছিল শনপাট, তামাক, আখ, খেজুর, কুসুম এবং বাগানে চাষোপযোগী নানা রকম গাছ-গাছড়া সম্পর্কে। জমিদারদের অনীহা সত্ত্বেও এসব গাছ-গাছড়ার চাষাবাদের কাজ বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

'অরুণোদয়' নামক দ্বি-মাসিক পত্রিকা হল খ্রীস্টান ট্রাক্ট সোসাইটির মুখপত্র। এর প্রকাশনা শুরু হয় ১৮৫৬ সালে। এর বার্ষিক চাঁদা এক টাকা। এ-পত্রিকা প্রকাশনার লক্ষ্য হল এদেশীয় জনসাধারণের মানসিক পুষ্টির জন্য খাদ্য সরবরাহ করা ছাড়াও, ঈশ্বরের পৃথিবীর যাবতীয় আশ্চর্য বস্তু, মানুষের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের বিবরণ এবং মনীষীদের জীবন-কাহিনী প্রকাশ করা, এদেশী পত্র-পত্রিকার গতি-প্রকৃতির উপর লক্ষ্য রাখা, প্রতিটি সংখ্যা দেশীয় জনসাধারণের রুচির অনুকূল সংবাদসমূহের সার-সংকলন করা, যে-সকল বড় বড় সমাজ-সংস্কারের সঙ্গে ভারতবর্ষীয় জন-সমাজের কল্যাণের প্রশ্ন জড়িত সে-সব সংস্কারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা এবং প্রতিটি সংখ্যা যুগের রুচি ও প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে সীসার পাতে কাটা ছবি দ্বারা চিত্রায়িত করা। ১৭০ জন এদেশীয় এবং ১০৩ জন ইউরোপীয় সহকারে পত্রিকার মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৮৩৫।

'ভারতবর্ষীয় সভাবিজ্ঞাপনী' হল বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র। এই এসো-সিয়েশন অদ্যাবধি এদেশে বসবাসকারী ইংরেজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করে আসছে। তারা এখন অনুভব করছে যে তাদের নিজেদের মতামতও জনসাধারণের অবশ্যই গোচরী-ভূত করা দরকার। সে-উদ্দেশ্যেই এই মাসিক পত্রিকাটির আত্মপ্রকাশ। এরপর অতি-সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত হয়েছে 'কলিকাতা পত্রিকা'।

অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রিকাগুলির মধ্যে ১৮১৮ সালে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' পত্রিকার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জে. মার্শসম্যান সম্পাদিত এই পত্রিকায় আমেরিকা আবিষ্কার, বেলুন, ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য, ভারতবর্ষের স্থানীয় উদ্ভিদ, বাফা, হাতী, প্রাচীন ইতিহাস, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নগরসমূহ সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যালয়সমূহের জন্য পত্রিকাটি বিশেষ উপযোগী ছিল। ১৮১৯ সালে লন্ডন মিশনারী সোসাইটি নিজ ব্যয়ে 'গসপেল ম্যাগাজিন' নামে একটি সাময়িক পত্রিকার ২০০ কপি ছেপে প্রকাশ করে। এদেশীয় কেরানী এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত পল্লীবাসীদের মধ্যে বিক্রয় ও বিতরণ করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। এ-পত্রিকায় জীবনী, ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দর্শন ও মৃত্যুপথযাত্রী খ্রীস্টানদের উক্তি প্রকাশিত হত।৬০ এর কোন কোন অংশ চীনা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছিল। ১৮২১ সালে রামমোহন 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন' প্রকাশ করেন। পত্রিকাটি খ্রীস্টানদের ত্রিত্ববাদ-বিরোধী ছিল এবং মিশনারীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদের পক্ষ সমর্থন করত।

১৮৩১ থেকে ১৮৫১ সালের মধ্যে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল :

নাম	সাল	বিষয়
শাস্ত্র প্রকাশ	১৮৩১	পুরাণ ও শঙ্করাচার্য থেকে সংকলন
জ্ঞানোদয়	১৮৩১	রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ; ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক
জ্ঞানসিন্ধু তরঙ্গ	১৮৩২	রসিক মল্লিক সম্পাদিত ; নীতিতত্ত্ব ও সাহিত্য-বিষয়ক
পশ্বাবলী	১৮৩২	রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ; প্রাকৃতিক ইতিহাস-বিষয়ক
চার আনা পত্রিকা	১৮৩৩	নৈতিক নিবন্ধ এবং ইতিহাস ও উপাখ্যান-মূলক
বিদ্যাসার সংগ্রহ	১৮৩৪	সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সার-সংকলন[৬১]
জ্ঞান দীপিকা	১৮৪০	ভবানী চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত
শশধর	১৮৪২	কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত
বিদ্যাদর্শন	১৮৪২	অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ; নীতিতত্ত্ব ও সাহিত্য-বিষয়ক
মঙ্গলোপাখ্যান	১৮৪৩	গীর্জার ইতিহাস, মুসলমান ধর্ম, খ্রীস্টানদের কর্তব্য
সর্ব রসরঞ্জিকা	১৮৪৪	ইতিহাস ও নীতি-তত্ত্ব
উপদেশক	১৮৪৬	ধর্মীয় ও সাহিত্যিক তথ্য
জগৎবন্ধু পত্রিকা	১৮৪৬	সাহিত্য-বিষয়ক, হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক সম্পাদিত
কৌস্তভ কিরণ	১৮৪৬	বর্ণ ও জ্যোতিষ-বিষয়ক ; রাজেন্দ্রনারায়ণ মিত্র সম্পাদিত
সত্য সঞ্চারিণী	১৮৪৭	স্ত্রীশিক্ষার প্রবক্তা[৬২]
কায়স্থ কিরণ	১৮৪৭	কায়স্থদের পৈতা ধারণের অধিকারের প্রবক্তা
হিন্দুধর্ম চন্দ্রোদয়	১৮৪৭	পৌরাণিক হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে[৬৩]
দুর্জন দমন মহানবমী	১৮৪৭	পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের স্বপক্ষে ; মোহন দাস সম্পাদিত[৬৪]
জ্ঞান সঞ্চারিণী	১৮৪৮	কাচরাপাড়া সভার মুখপত্র
কাব্য রত্নাকর	১৮৪৮	হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা সম্পাদিত
মুক্তাবলী	১৮৪৮	শিবপুরের কালিকান্ত সম্পাদিত[৬৫]
ভক্তি সূচক	১৮৪৯	রামনিধি সম্পাদিত
রস রত্নাকর	১৮৪৯	যদুনাথ পাল

নাম	সাল	বিষয়
সত্যার্ণব	১৮৪৯	সাহিত্যিক এবং খ্রীস্ট ধর্মীয়
সত্য-ধর্ম প্রকাশিকা	১৮৪৯	কর্তওজা রীতির প্রবক্তা
দূরবীক্ষণিকা	১৮৫০	দ্বারকানাথ মজুমদার সম্পাদিত
সর্বশুভকরী	১৮৫০	নদীতে শিশু নিক্ষেপ, চরকপূজা, বাল্য-বিবাহ প্রভৃতি বিরোধী
ধর্মমর্ম প্রকাশিকা	১৮৫০	কোননগরস্থ সভার মুখপত্র
জ্ঞান দর্শন	১৮৫১	নিত্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বিষয়ক
সুধাংশু	১৮৫২	প্রয়োজনীয় ও ধর্মীয় তথ্যাদি-বিষয়ক [৬৬]
জ্ঞানোদয়	১৮৫২	সি. এস. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
সুলভ পত্রিকা	১৮৫৩	রামচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত [৬৭]
ধর্মরাজ	১৮৫৪	পৌরাণিক হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে
বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা	১৮৫৪	নীতিকথা ও অন্যান্য বিষয়ে নিবন্ধ

এনসাইক্লোপিডিয়া কিংবা গ্রন্থমালার আকারে প্রকাশিত পুস্তকসমূহের মধ্যে ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ৫ম সংস্করণ থেকে ১৮১৮ সালে এফ. কেরী কর্তৃক অনূদিত ৬৩৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত অস্থিবিদ্যার একটি পুস্তক। শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক একটি গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ হিসেবে এটি প্রকাশিত হয়েছিল; কিন্তু ৩০০ বাঙালী গ্রাহক থাকা সত্ত্বেও এ-গ্রন্থমালার আর কোন পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। এ-পুস্তকটির দাম ছিল খুবই বেশী। প্রতি কপি ছয় টাকা। তদুপরি পুস্তক ব্যবহারের জন্য তৎকালে দেশে কোন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না; এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে চিকিৎসা বিষয়ে ইংরেজী অবলম্বনে অনেক উন্নত মানের লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

ইংরেজী ও সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রখ্যাত পণ্ডিত উইলসন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অনুবাদের উদ্দেশ্যে স্থাপিত 'সোসাইটি ফর ট্রান্সলেটিং ইউরোপিয়ান সাইন্স' নামক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন ১৮২৮ সালে। এই সমিতি 'বিজ্ঞান সেবধি' নামে একটি গ্রন্থমালা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন। বর্তমানে এ-গ্রন্থের ১৫টি খণ্ডের সংকলন সমাপ্ত হয়েছে। এদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ভারতবর্ষের ভূগোল, জল-পরিসংখ্যান যন্ত্র-বিদ্যা, আলোক-বিজ্ঞান ও বায়ু-বিজ্ঞান এবং তৎসহ বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে ব্রোম্যানের রচনা থেকে অনুবাদ। জন-শিক্ষা কমিটি এ-গ্রন্থের ১০০ কপির গ্রাহক হয়েছে।

১৮৪৬ সালে সরকার রেভারেন্ড কে. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বাংলা শব্দকোষ' নামক একটি গ্রন্থমালার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। জীবনী, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা প্রকাশ করাই ছিল এ-গ্রন্থমালা প্রকাশের উদ্দেশ্য। নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল: গ্যালিলিওর জীবন-চরিত, রোমের ইতিহাস,

মিশরের ইতিহাস, কনফুসিয়াস, প্লেটো, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড, সুলতান মাহমুদের জীবনী, নীতি-কাহিনী, এডামস কিং-এর দূত এবং এগসওয়ার্থের সততার পুরস্কার, পৃথিবীর ভূগোল, ইতিহাসের বিবিধ পাঠ-সংকলন, সমুদ্র যাত্রা, এপোথেগাস, হিন্দু, গ্রীক ও রোমান লেখকদের রচনা থেকে চয়ন, মনের উন্নতি বিধান ইত্যাদি প্রসঙ্গ। এ-গ্রন্থমালার জন্য খুব বেশী মূল্য ধার্য করা হয়েছিল। এর বাংলা কপিগুলি অতি দ্রুত নিঃশেষিত হলেও বহুভাষী ইংরেজী-বাংলা কপিগুলির মূল্য কমিয়ে শুধুমাত্র কাগজের দামের সমান না করা পর্যন্ত অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে ছিল।[৬৮]

এই পুস্তকের তালিকায় যদিও "সার্বজনীন ভাষার পুস্তকাবলী"র নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই, তাহলেও দেবদেবীর কীর্তিকাহিনী-ভিত্তিক মুদ্রিত অথবা রঙ করা ছবি দুই পয়সা দামে হাজারে হাজারে বিক্রী হচ্ছে। এগুলি এদেশীয় লোকেরা তাদের দোকান ঘরের দেয়ালে এঁটে রাখে। এদের সাহায্যে নিরক্ষর হিন্দু তার ধর্মের ইতিবৃত্ত জানতে পারে। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের সরকার আগ্রা কারাগারে কিছু পশু-পাখির ছবি, সংশ্লিষ্ট পরিচিতি সহকারে, লিথোগ্রাফ করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগ এখনও[৬৯] এ-বিষয়ে কিছু করে নাই। আসামে অবশ্য আমেরিকান মিশনারীরা ১৮৪৬ সাল থেকে 'অরুণোদয়' নামে একটি চমৎকার মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। এই পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় থাকে ৭/৮ টি কাঠ-খোদাই চিত্র। একজন আমেরিকানের তত্ত্বাবধানে আসামের লোকেরাই এই-কাঠ খোদাইগুলি তৈরী করে। রাশিয়ায় জনপ্রিয় সাহিত্যে সংখ্যা ও প্রকৃতির দিক দিয়ে চিত্রের স্থান সর্বাগ্রে। কৃষকদের ঘরে এইগুলি সারিবদ্ধভাবে সাজান থাকে। কিন্তু রাশিয়ার চিত্রসমূহে যে নৈতিক ও ব্যঙ্গাত্মক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে বাংলা ছবির সঙ্গে, কেবল জাহাজ ও সৈনিকের রূপরেখা ব্যতীত, সে-সব বিষয়ের কোন মিলই নাই। সৈনিকের চিত্র জগন্নাথের রথের গায়েও আঁকা থাকে। এখানে মার্স পরাভূত করেছে পুষ্পধনুকে, আদিরসের পরাভব ঘটেছে প্রেমের কাছে। কলকাতার ইনডাস্ট্রিয়াল আর্ট স্কুল খুব সহজে কাঠ-খোদাই সরবরাহ করতে পারে। চিত্রের জন্য ভারতবর্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, পোষাক-পরিচ্ছদ, স্থাপত্য, পাখী, উদ্ভিদ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাংলা গানে মদের আরতি কিংবা স্কচদের মত যুদ্ধের প্রশস্তি অনুরণিত হয় নাই। বাংলা গান অনঙ্গদেব ও পরিচিত দেবদেবীর মহিমা-কীর্তনে নিবেদিত। এগুলি যেমনি নোংরা তেমনই অশুচিকর। এদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঁচালী নানা উৎসবে গাওয়া হয়। এদের অসংখ্য সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং লোকেরা হাজার হাজার কপি ক্রয় করে। কোন কোনটি বেশ ভাল কাগজে শোভন রূপে মুদ্রিত, আবার কোন কোনটি পুরাতন পরিত্যাক্ত কেম্বিসের থলের উপরে ছাপা। পাঁচালী হচ্ছে আবৃত্তির উদ্দেশ্যে রচিত ছন্দোবদ্ধ আখ্যায়িকা। এগুলি সাধারণতঃ হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র থেকে গৃহীত এবং শিব ও বিষ্ণু সম্পর্কিত। পাঁচালী বাদ্য সহকারে গীত হয় এবং এদের মধ্যে কোন কোন অংশে এনাক্রিয়নের অনুরূপ রচনাশৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হল দশরথ রায়। পাঁচালী রচনা করে তিনি প্রচুর অর্থ লাভ করেছেন। পঞ্চাশ বছর আগে এন্টনী নামে এক পর্তুগীজ অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। আরও একজন পাঁচালীকার রসিকচন্দ্র রায়। নিধুর (নিধু বাবু) রচিত পাঁচালী এ-যুগেও গীত হয়। শোনা যায় যে তিনি নাকি তার সবচেয়ে ভাল গানগুলি মাতাল অবস্থাতেই রচনা করেছিলেন।

যাত্রা হল নাটকেরই এক রূপ। এ-হচ্ছে অতিশয় নোংরা জিনিস। অনেকটা লন্ডনের পেনি থিয়েটারের রীতিতে কৃষ্ণ-বিষয়ক বা লাম্পট্যমূলক অনুষ্ঠান। এগুলির মধ্যে ঝাড়ু হাতে একটি মেহতারের চরিত্র থাকে। প্রচলিত নল-দময়ন্তী যাত্রাগানে নলের[৭০] উপাখ্যানকেই এ-রীতিতে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বৈষ্ণবদের স্থান সকলের পুরোভাগে। তাদের সঙ্গীত ইতস্তত: ভ্রাম্যমাণ গায়কেরা সুর সহকারে গেয়ে থাকে।[৭১]

আমি কাটোয়ার নিকটবর্তী এক জায়গার তিনজন লোককে জানি যারা ইতালীয় স্বভাব-কবিদের (improvisatori) মত সংস্কৃত ভাষায় যে-কোন প্রদত্ত বিষয়ে উপস্থিত কবিতা রচনা করার প্রতিভার অধিকারী ছিল।

এ-সমস্ত জনপ্রিয় গান যে সর্বদাই প্রেম ও ভালবাসার ক্ষেত্রে সীমিত থাকত তা নয়, কখনো কখনো তাদের উপর রাজনীতির ছাপও পড়ত। যেমন নীলকরদেরকে অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হলে কোন কোন জেলার প্রজাদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা গিয়েছিল। সকলের মুখে এক কথা শোনা যেত "যে রক্ষক সেই ভক্ষক। যাকে আমাদের রক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল সেই শেষে নেকড়ে হল।" কৃষ্ণনগর জেলায় এদের একটি গানে সুর সংযোগ করে প্রচুর উদ্দীপনার সঙ্গে গাইতে দেখেছি।

নীচে এ-গানের ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হল :

Chorus

Ye sons of the soil
Alas : 'tis to fool ye
These Honorary Magistrates
Are appointed to rule ye !
The Land it is going to ruin,
Our rulers they see its undoin ?
They love us not—think ye they do, sirs ?

Pray, why then this dire application
Of the knife to the throat of our nation—
Come, answer me, why is it so, sirs ?
Ye sons of the soil, & co.

The Planter he sits on the seat, O !
Of Judgement the Witch whom the meat, O !
Of Infants delights now holds sway
O' er the Nursery dom'd to destruction !
The Ape wields the sword of Protection !
O hapless Bengala ! ery 'Lack ! 'Lackaday !
Ye sons of the Soil, & co.

The Planter, who e'en our priests, sirs.
To plough—to his mill to bring grist sirs,—
And makes us all slaves —high or low !
O Lady of Albion ! Our Sovereign—our mother,
O save us ere we sink "neath the blow !
Ye sons of the Soil, & co.

বস্তুতঃ নীলকরদের উপর এদেশের সকল শ্রেণীর লোকই ভীষণ বিরূপ।[৭২] এখানকার লোকসংগীতে নীলকরদের নির্যাতন প্রতিরোধের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু বাংলা গীতিকাগুলির মধ্যে রাশিয়া কিংবা ব্রিটেনের গ্রামীণদের মত কিংবা মধ্যযুগীয় চারণ গীতিকারদের অনুরূপ কোন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

সংস্কৃত—বিক্রয়ের জন্য মুদ্রিত ১৫,০০০ কপি

হিন্দুদের ধর্মীয় দিক থেকে সংস্কৃতের চর্চা অধুনা হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে ভাষাতত্ত্ব অনুশীলনের বিষয় হিসেবে এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে বিশিষ্টার্থক শব্দ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে সংস্কৃতের উপর অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবময় দিনগুলির সঙ্গে জড়িত বলে সাজাত্যবোধসম্পন্ন হিন্দুদের কাছে সংস্কৃত সর্বদাই পঠনের ও সমাদরের বিষয় হয়ে থাকবে।[৭৩]

অবিমিশ্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহকেই আমরা সংস্কৃতের শ্রেণীভুক্ত করেছি। অন্যান্য বিবিধ গ্রন্থ, যেমন বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্র রচনাগুলিকে এ-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।[৭৪]

প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনায় এবং বাৎসল্য ও পারিবারিক স্নেহ-প্রীতির চিত্র অঙ্কনে সংস্কৃত ভাষার কাব্যশক্তি অসাধারণ। যেমন, রামায়ণে রামের প্রতি সীতার অনন্যসাধারণ অনুরাগ, রঘুবংশ কাব্যে পত্নী ইন্দুমতীর মৃত্যুতে অজার বিলাপ কিংবা শকুন্তলা নাটকে পিত্রালয়ের সুরম্য বন ও সুদর্শন কুরঙ্গদের ছেড়ে যাওয়ার সময় শকুন্তলার খেদোক্তির চিত্র। এ-জন্যেই এ-জাতীয় গ্রন্থগুলির অনুবাদ সাফল্য লাভে সমর্থ হয়েছে।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে যারা অগ্রণীর ভূমিকা পালন করছেন, যারা এখন বাংলা ভাষার বাহক ও ধারক, তারা হলেন ইংরেজী থেকে ভাব-সম্পদ আহরণ করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ। বাংলা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য তথ্যের সুষ্ঠু

বাহনে পরিণত করার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুদক্ষ পরিচালনাধীন সংস্কৃত কলেজের অশেষ প্রভাব রয়েছে। সংস্কৃত কলেজকে এখন প্রকৃতপক্ষে একটি ভাষাতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

'সর্বার্থ পূর্ণচন্দ্রোদয়' নামে একটি মাসিক পত্রিকার ১,৫০০ কপি কাটতি হয়। এ-পত্রিকায় মূল সংস্কৃত পাঠ সহকারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার অনুবাদ ছাড়াও নিম্নোক্ত পুরাণসমূহের অনুবাদ প্রকাশিত হয়: মার্কেণ্ডেয়, কূর্ম, মৎস্য, কলি, ব্রাহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, গরুড়, বরাহ, হরিবংশ ও মহাভারত।

ডগলাস স্টুয়ার্ট তাঁর একটি নিবন্ধে এবং হামবোল্ড (Humboldt) তাঁর 'কস্‌মস্' নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে কিভাবে "ইন্দ্রিয়ানুভূতি থেকে ভাবে" (sense to spirit) ভাষার সাধারণ বিকাশ ঘটে। এর অর্থ হল, একটি শব্দের প্রাথমিক অর্থ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু থেকে গৃহীত হয় এবং পরে তা পরাবস্তুরূপে বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবের বিষয়ে প্রযুক্ত হয়। এই তত্ত্বের সুন্দর দৃষ্টান্ত হল সংস্কৃত ধাতুগুলি। যেমন, 'সরল' মানে খাড়াভাবে অবস্থিত ও খাঁটি; 'অবগত' মানে জানা হয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ মধ্যদিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে; 'স্নিগ্ধ' মানে তৈলাক্ত ও অমায়িক; 'পঙ্ক' মানে ময়লা ও পাপ, 'কুট' মানে ঠগ, জালিয়াত; 'দূরদর্শী' মানে জ্ঞানী ও দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন; 'স্থূল' মানে বোকা ও মোটা; 'স্ফুট' মানে জ্ঞাত এবং ফুলের মত বিকশিত; 'গোয়ার' মানে নির্বোধ, অর্থাৎ গরুর মাথা যুক্ত; 'অগ্নিশর্মা' মানে উত্তেজনাপ্রবণ, অর্থাৎ যে আগুন নিয়ে আমোদ পায়; 'আকারগুপ্ত' মানে কপটতা, অর্থাৎ যে আপন রূপ গোপন করে; 'তিরস্কার' মানে ভর্ৎসনা, অর্থাৎ একজনকে জালিয়াত বানানো; 'ক্ষুদ্রদৃষ্টি' মানে কৃপণ, অর্থাৎ ক্ষুদ্র বস্তুর দিকে যার নজর; 'উদরসাৎ' মানে উদরপরায়ণ, অর্থাৎ যার উদরে একটা শয়তান বাস করে; এর অন্য শব্দ হল 'উদরসর্বস্ব' বা 'পেটুক' অর্থাৎ যার কেবল উদরই আছে।

আমার এই সংক্ষিপ্ত বিবরণে কলকাতার বাংলা ছাপাখানাসমূহের এক বছরের অর্থাৎ এপ্রিল, ১৮৫৭ থেকে এপ্রিল, ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত সময়ের পরিসংখ্যানের উপসংহারে উপনীত হয়েছি। দেশীয় ছাপাখানাসমূহের অনেক অপূর্ণতা সত্ত্বেও তারা এগিয়ে চলেছে; উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের আশ্বাস নিয়ে দিবসের শুরু হয়েছে। এই প্রতিবেদনের পরিসংখ্যান যাচাই করেছি এ-ভাবে: বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত বইপত্রগুলি আমি কিনেছি, স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে আমি নানাদিকে এজেন্ট পাঠিয়ে দেশীয় পুস্তকাদির বিবরণ সংগ্রহ করেছি এবং তথ্য যাচাই করার জন্যে আমি নিজে প্রত্যেকটি ছাপাখানায় দু'বার করে গিয়েছি। বই ছাপাবার সাধারণ রীতি হচ্ছে ১,০০০ কপি করে ছাপানো। এর কমে পোষায় না। আমি আমার প্রতিবেদনের সঙ্গে পুলিশের প্রতিবেদনও মিলিয়ে দেখেছি। ছাপাখানাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে ১৮৫৭ সালের স্পেশাল এ্যাক্ট অনুসারে যে-কোন ভাষায় প্রকাশিত পুস্তক ও পুস্তিকার এক কপি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট জমা দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল, এ-আদেশ অমান্য করা হলে গুরুতর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুদ্রিত পুস্তকের অর্ধেকও পুলিশের কাছে পৌঁছে নাই। এর দ্বারা বুঝা যায় যে এ-দেশে প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া কত কঠিন ব্যাপার। এ-দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত এমন সব দলের উপর যাদের এগুলি সংগ্রহের সামর্থ্য এবং সময় দুই-ই আছে।

এই বিবরণে শুধু কলকাতার ছাপাখানাগুলির কথা বলা হল। এখন আমরা মফস্বলের ছাপাখানাগুলির দিকে নজর দেব। প্রথমে শ্রীরামপুরের ছাপাখানাগুলির কথা। ১৭৯৩ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশীয় ছাপাখানার ক্রমবিকাশের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ওতো-প্রোতভাবে জড়িত। এখানে কেরী তাঁর বাইবেলের অনুবাদের (অত্যন্ত কাঁচা রচনা হলেও) প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করেছিলেন ১৭৯৩ সালে। বর্তমানে এখানে এদেশীয় লোকদের ব্যবস্থাপনাধীনে 'তমোহর প্রেস' থেকে প্রয়োজনীয় বিষয়ে ও শোভন আকারে মুদ্রিত বইপত্র প্রকাশিত হচ্ছে। এই ছাপাখানায় ১৮৫৭ সালে নিম্নোক্ত পুস্তকসমূহ মুদ্রিত হয়েছিল :[৭৫] শ্রীরামপুরে বিদ্যাদায়িনী প্রেস নামে আরও একটি ছাপাখানা আছে। এ-ছাপাখানা থেকে ১৮৫৭ সালে যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির তালিকা তথ্য-নির্দেশে দেওয়া হল।[৭৬] এ-ছাড়াও এখানে আছে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া প্রেস'। এ-প্রেস থেকে প্রতি সপ্তাহে ২,৫০০ কপি করে সরকারী গেজেট মুদ্রিত হয়। তাছাড়া মাঝে-মাঝে কিছু-কিছু ধর্মীয় পুস্তকও ছাপা হয় : যেমন, বিনিয়নের 'হলি ওয়্যার', বিভিন্ন অভিধান ও আইন সংক্রান্ত পুস্তকাদি। বর্তমানে এই প্রেসটি যেখানে আছে, পূর্বে পুরাতন প্রেসটি সেখানেই ছিল। সেই প্রেস থেকে তখনকার দিনে নিয়মিত পুস্তকাদি প্রকাশ করার পরেও হাজার হাজার পুস্তক, কোন কোন বছর ১০০,০০০ পর্যন্ত বাংলা পুস্তিকা প্রকাশিত হত। ১৮৫৭ সালে চন্দ্রোদয় প্রেস থেকে নিম্নোক্ত পুস্তকসমূহ প্রকাশিত হয়েছে।[৭৭]

রংপুরে জনৈক বিদ্যোৎসাহী জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি ছাপাখানা চালু আছে। এই ছাপাখানা থেকে বিবিধ পুস্তক ও একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। বর্ধমান থেকেও বহু পুস্তক এবং সংবাদপত্র প্রকাশ করা হয়েছে।[৭৮] ১৭৭৮ সালে বাংলা ভাষার প্রথম মুদ্রিত পুস্তক হালহ্যাডের ব্যাকরণ মুদ্রিত করার সৌভাগ্য হয়েছিল হুগলীর। এখান থেকে এখনও মাঝে মাঝে দু'একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সাসারাম ছাড়া সমগ্র বিহারে স্থানীয় লোকদের কোন ছাপাখানা নেই। সাসারামে শাহ কবিরউদ্দিনের একটি ছাপাখানা আছে; যেখান থেকে বহু আরবী, ফারসী ও উর্দু পুস্তক লিথোগ্রাফ পদ্ধতিতে ছাপা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতিতে যে-সমস্ত শক্তি সহায়তা করছে এখন তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। এদের মধ্যে স্থানীয় লোকদের প্রচেষ্টাই হল প্রধান। ইউরোপীয়গণ আর্থিক এবং অন্যান্য দিক দিয়ে সহায়তা করতে পারে কিন্তু সাহিত্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে একান্তভাবে স্থানীয় লোকদের। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল প্রাক্তন জনশিক্ষা কমিটি। এ-কমিটি ১৮৫৪ সালে তাদের প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করে বলেছিল যে "পরিণামে একটি বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমস্ত

কর্মপ্রচেষ্টাকে পরিচালিত করতে হবে।" ১৮৫৪ সালে এই কমিটি অবলুপ্ত হয়ে যায়। কমিটি তাদের বিঘোষিত নীতির বাস্তবায়নের জন্যে কোন কিছুই করে নাই। তাদের এংলো-ভার্নাকুলার কলেজের অবস্থাও তথৈবচ। এ-কলেজটি এই তত্ত্বের সত্যতাই প্রমাণ করেছে যে, 'স্বল্প সংখ্যক লোকের হাতে শিক্ষা কুক্ষিগত থাকলে তা তাদের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ার এবং অশিক্ষিতদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করার প্রবণতা নিয়ে আসে।'

বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম শক্তি হচ্ছে কলকতা, হুগলী ও ঢাকার গভর্নমেন্ট নর্মাল ভার্নাকুলার স্কুলগুলি। এ-সব স্কুলে অধ্যয়নরত ৩০০ ছাত্রই বঙ্গদেশের বাংলা ভাষার প্রধান শিক্ষক হবেন। দৃষ্টান্তস্থলে উল্লেখ করা যেতে পারে যে হুগলী নর্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ মহোদয় বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে নিয়মিত ভাষণ দিয়ে থাকেন।[৭৯] ছাত্রেরা সে-ভাষণ টুকে নেয় এবং সেজন্যেই তাঁর রচিত ও প্রকাশিত নিম্নোক্ত বাংলা পুস্তকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে :

প্রকৃতি বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক দর্শন বিষয়ে একটি সন্দর্ভ, প্রথম খণ্ড; শিক্ষা বিষয়ে একটি নিবন্ধ; পুরাবৃত্তমার বা প্রাচীন ইতিহাস, ১ম খণ্ড; প্রাকৃত দর্শন, ২য় খণ্ড; টীকাসহ ইউক্লিড। তাঁর প্রাণিবিদ্যা ও ইংল্যান্ডের ইতিহাসসংক্রান্ত গ্রন্থ যন্ত্রস্থ আছে। একজন সজীব শিক্ষক একদিকে যেমন পুস্তকের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করেন, অপরদিকে তেমনি পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থাও করেন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় আমরা অনুরূপ ব্যাপারই লক্ষ্য করেছি।

ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি

এই সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে। যে-সকল পুস্তকের অনুবাদ খ্রীস্টীয় পুস্তিকা বা জ্ঞান সম্প্রসারণ সমিতিগুলির কিংবা স্কুলবুক বা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রকাশিতব্য পুস্তকের তালিকায় স্থান পায় নাই সেগুলি প্রকাশ করাই এই সোসাইটির লক্ষ্য ছিল। অনুরূপভাবে একটি অত্যাবশ্যকীয় ও বলিষ্ঠ ধরোয়া বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিও তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল কয়েক গ্রন্থ অনুবাদ ও অনুসৃত গ্রন্থ প্রকাশনার পর, একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। পত্রিকাটির প্রত্যেক সংখ্যায় পৃষ্ঠা ছিল ১৬; ৩টি করে চিত্র থাকত এবং মাত্র দু'আনা মূল্যে বিক্রয় হত। অচিরেই এর প্রচার সংখ্যা ১,২০০-তে দাঁড়ায়। মাননীয় জে. বেথুন এই সোসাইটিকে লন্ডনের ডাকসাইটে প্রকাশক মি. নাইট-এর কাছ থেকে এনে ৮৭টি প্লেট প্রদান করেন। সোসাইটি তাদের সমস্ত বইগুলি চিত্রায়িত করার উদ্দেশ্যে লন্ডনে আরও ১,০০০ টাকা মূল্যের প্লেটের জন্য অর্ডার পাঠিয়েছে। মাননীয় জে. বেথুন ও বাবু জে. কে. মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকে ১,০০০ টাকা করে সাহায্য করেছেন। সোসাইটির সাহায্যদাতার সংখ্যা স্বল্প হলেও তাদের সাহায্যের পরিমাণ স্বল্প নয়।

উৎপাদন মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে বই বিক্রয় করার দরুন এবং তাদের মাসিক পত্রিকার জন্যে সম্পাদক বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে প্রতি মাসে ৮০ টাকা হিসেবে

ভূর্তকী দিতে হত বলে পত্রিকাটি সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে মাসিক ১৫০ টাকা মঞ্জুরী লাভ করে। বেনারসের বাঙালী অধিবাসীগণও সোসাইটিকে মুক্ত হস্তে সাহায্য পাঠিয়েছে। ১৮৫১ সাল থেকে ১৮৫৬ সাল পর্যন্ত সোসাইটির হিসাব-পত্র ছিল নিম্নরূপ: চাঁদা ও দান—৮,৬২৩ টাকা, ব্যয়—৯,৬৮১ টাকা। ১৮৫৪ সালের বিক্রয় হয়েছে—৬৮৬ টাকা, ১৮৫৫ সালের বিক্রয় হয়েছে—৩৩৩ টাকা। প্রকাশিত হয়েছিল ১৩,০০০ খণ্ড পুস্তক।

সোসাইটি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এইচ. প্রাট বি.সি.এস. সোসাইটির উদ্দেশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেছেন: "সোসাইটির মতে শাসকশ্রেণীর কুক্ষিগত অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশ করতে হলে ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করতেই হবে, আড়াই কোটি স্থানীয় লোকের জন্যে এই শর্ত আরোপ করার অর্থ তাদের প্রতি চরম অবিচার প্রদর্শন করা। এরূপ একটি ব্যবস্থা এদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর উন্নতি বা অগ্রগতির সকল পথ রুদ্ধ করে দেবে। এর ফলে, জ্ঞানভাণ্ডারকে বিশেষ শ্রেণীর জন্যে নির্দিষ্ট রাখার প্রাচ্যদেশীয় যে গর্হিত-রীতি আছে তা-ই তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্যে পরিকল্পিত একটি যথার্থ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞানের প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া এবং সহজ উপকরণের সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করার জন্যে শহরে, গ্রামে, ঘরে-ঘরে সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি করা; মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণকর যে-সকল বিজ্ঞান, যেমন প্রাকৃতিক দর্শন, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক পরিচিতি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-বিধানসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান-সুলভ সাহিত্যের মাধ্যমে সকলের নাগালের মধ্যে পৌঁছান; ইউরোপের যন্ত্রশিল্প এবং বাণিজ্য ও অর্থনীতির সূত্রগুলির সঙ্গে অবহিত হওয়া যাতে সকলের চাহিদা সম্বন্ধে অবগত হয়ে সরবরাহের উপায় উদ্ভাবন করা যায়। সর্বশেষে, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নৈতিক ও ধর্মীয় সত্যগুলিকে সর্বত্র আরও উত্তমরূপে উপলব্ধি করা এবং এভাবে সকলের মিলনের উপযোগী একটি সাধারণ ক্ষেত্র তৈরির মাধ্যমে জ্ঞান ও অগ্রগতির উৎসগুলির বিকাশের দ্বারা এদেশীয় সমাজের বিভিন্ন বড় বড় মহলের মধ্যে নতুন যোগসূত্র রচনা করা। তা হলেই শিক্ষা অনেকের জন্যে এবং সকলের জন্যে, আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিতে পারে।

এই সকল লক্ষ্য সামনে রেখেই বাংলা ভাষার একটি জনপ্রিয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সোসাইটির সামনে যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে, শুধু মাত্র অনুবাদের দ্বারা সেখানে পৌঁছান সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ ও ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের মধ্যে কেবল ভাষাগত ব্যবধানই বিদ্যমান নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে এই দুই দেশের মধ্যে এর চেয়েও বড় পার্থক্য রয়েছে—ভাবধারা, মিলবন্ধন ও সাহিত্যের পার্থক্য।

জনসাধারণকে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারে শুধুমাত্র দেশজ ভাষার ব্যবহারই যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আরও কিছু দরকার। বর্তমানে যে-রূপে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাকে এদেশীয়

মানুষের ভাবাবেগ ও অনুভূতির কাছে আবেদনশীল করে তুলতে হবে। এদের সাহিত্যে ও সমাজে আমরা যা লক্ষ্য করেছি, আমাদের সত্য প্রচারের নীতির সঙ্গে সংগতি রেখে, সেগুলিকে সর্বতোভাবে কাজে লাগাতে হবে। বাংলার সমগ্র সাহিত্য, এমনকি অতি সাধারণ শ্রেণীর সাহিত্যও, পরোক্ষ উক্তিতে (allusions) পূর্ণ। শব্দার্থের মত এ-সব পরোক্ষ উক্তির তাৎপর্যও আমাদের বুঝতে হবে। কেননা পরোক্ষ উক্তির বিষয়গুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে শব্দগুলি তাদের ইপ্সিত তাৎপর্যের অর্ধেকও প্রকাশ করতে সক্ষম হবে না। তাই, এই উদ্দেশ্যে কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত সকল পুস্তক স্থানীয় লোকদের প্রকৃত মনোভাব—তাদের প্রকৃতি ও সমাজবিন্যাসের দিকে নজর রেখে সযত্নে কাজে লাগাতে হবে।

১৮৫৭ সন পর্যন্ত সোসাইটি ১৭টি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। এগুলি হচ্ছে: ক্লাইভ ও প্রতাপাদিত্যের জীবনী, একটি পঞ্জিকা, রবিনসন ক্রুশো, পল এন্ড ভার্জিনিয়া, গেঞ্জেস ক্যানাল, বাংলা সংবাদপত্র থেকে চয়ন, বৃহৎকথা, পার্লে-কৃত ওয়ান্ডার্স অব হিস্ট্রি, এন্ডারসন কর্তৃক ওয়াইল্ড সোয়ান্স্, চাইল্ডস্ অউন বুক, ল্যাম্বস টেল্স ফ্রম শেক্স্পীয়ার, ১৮৫৭ থেকে ১৮৫৮ পর্যন্ত সময়ের এক সাময়িকপত্র, পার্সী এনেক্রডাটস ২য় সংস্করণ, চিন্তার বস্তু, 'বড় কইলাস', চাইনিজ নাইটিংগল, দুঃখিনী মাতা, ইন্ডিয়ান রোমান্স, নূর-জেহান, ফোর উইন্ডস্ এলিজাবেথ অর একজাইল্স অব সাইবেরিয়া, এবং আগ্লী ডাক্লিংস।

সোসাইটির গত প্রতিবেদনে তারা তাদের পুস্তক বিক্রয়ের অভিজ্ঞতার ফলাফল এভাবে প্রকাশ করেছেন।[৮০]

সংশ্লিষ্ট পরিশিষ্ট অংশে প্রকাশিত গ্রন্থ, গ্রন্থের অনুবাদক, মূল্য, ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত প্রতিটি গ্রন্থের মোট কপি, ১৯৫৭-৫৮ সালে বিক্রীত পুস্তকের সংখ্যা এবং মফস্বলের এজেন্টদের বিক্রয়ের বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

মাননীয়া হেস্টিংস-পত্নী এবং অন্যান্য ইউরোপীয়দের সুপারিশক্রমে, সুলভে বিক্রয় কিংবা বিনামূল্যে বিতরণের উদ্দেশ্যে পুস্তক প্রকাশনার ব্যবস্থা করার জন্য ১৮১৭ সালে 'স্কুল বুক সোসাইটি' স্থাপিত হয়। এই সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রমের দ্বারা স্থানীয় পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। ১৮১৯ থেকে ১৮৫৯ সালের মধ্যে সোসাইটি কর্তৃক নিম্নোক্ত পুস্তকগুলি প্রকাশ করা হয়েছে: স্টুয়ার্টের প্রাথমিক নামতার পুস্তক, ১৮১৮—মে-কৃত অঙ্কের নামতা, ১৮১৮—রবিনসনের কলেরার প্রতিকার, ১৮১৮—পিয়ার্সনের বাংলা পাঠ, ১৮১৮—নীতিকথা, ১ম ভাগ, ১৮১৮—এফ. কেরী-কৃত গোল্ডস্মিথের ইংল্যান্ড, ১৮১৯—রাধাকান্তের স্পেলিং বুক, ১৮১৯—হর্লের গণিত, ১৮১৯—পিয়ার্সনের নীতিকথা, ২য় ভাগ, ১৮১৯—টি. দত্তের মনোরঞ্জন ইতিহাস, ১৮১৯—পিয়ার্সনের বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, ১৮১৯—ল'সনের সিংহের ইতিবৃত্ত, ১৮১৯—রামচন্দ্রের শব্দকোষ, ১৮২০—পাঠ লিখন, ১৮২০—পিয়ার্সনের সহজ পত্রলিখন, ১৮২০—পিয়ার্সনের ভূগোল, ১৮২০—পিয়ার্সনের ইতিহাস

কাহিনী, ১৮২০। সুলভে পুস্তক প্রকাশনার জন্যে ১৯২২ সালে সোসাইটি সরকারের কাছ থেকে মাসিক ৫০০ টাকা মঞ্জুরী পায়। সোসাইটি তার কার্যারম্ভের প্রথম চার বছরে ১৬টি পুস্তক প্রকাশ করে। তন্মধ্যে সংস্কৃতে ১,০০০ কপি, উর্দুতে ১০,১৫০ কপি, ফারসী ভাষায় ১২৩ কপি এবং ইংরেজী-বাংলায় ২,৮০০ কপি ছাড়াও বাংলা ভাষায় ছিল মোট ৪৮,৭৫০ কপি। এতদ্ব্যতীত সোসাইটি ৩টি বাংলা পুস্তকের ৩১,০০০ কপি এবং ইংরেজী-বাংলা পুস্তকের ১৫,০০০ কপির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে গৌরমোহনের পুস্তক, ১৮২২—জমিদারী হিসাব, ১৮২২—সচিত্র বর্ণবোধ, ১৮২৩—পিয়ার্সনের ভূগোল, ১৮২৩—পৃথিবীর মানচিত্র, ১৮২৩—ইয়েট্‌সের প্রাকৃতিক দর্শন, ১৮২৬—কলেরা সম্পর্কে ব্রিটমের পুস্তক, ১৮২৬—প্রাচীন ইতিহাস, ১৮২৬—ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৩১—মনীষীদের জীবন-চরিত, ১৮৩১—রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ, ১৮৩৩—পশু জীবনী, ১৮৩৫—বাংলা পাঠ, ১৮৪৩—রামচন্দ্রের পক্ষী-বিজ্ঞান, ১৮৪৪—বাংলা অভিধান, ১৮৪৪—পরিমাণ প্রাথমিকা, ১৮৪৫—হস্তি ও উষ্ট্রের ইতিহাস, ১৮৪৮—ভারতবর্ষের ইতিহাস, ১৮৫৩—জ্ঞান-দীপিকা, ১৮৫৪ ইত্যাদি।

সোসাইটি যে পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থ সাহায্য লাভ করেছে তার তুলনায় বিচার করলে এ-তালিকাকে মোটের উপর অপর্যাপ্ত বলতে হবে। সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই চাঁদা ও দান হিসেবে পেয়েছিল ১৭,১৫০ টাকা। এর পর আবার সরকারী অনুদান পেয়েছে ২,৩৫,০০০ টাকা। তাছাড়া সোসাইটির প্রকাশিত পুস্তকগুলির দামও ধার্য করা হয়েছে ন্যায্য মূল্যের দ্বিগুণ।

এ্যাংলো-ভার্নাকুলার স্কুলগুলি এখন আরও সঠিকভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া এবং এ-ভাষার মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়েছে। কোন কোন স্কুলে বালকদের বাংলা ভাষার মাধ্যমেই বঙ্গদেশের এবং ইংল্যান্ডের ইতিহাস, প্রাথমিক প্রাকৃতিক দর্শন, শরীরবিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিষয়ক পাঠ এবং প্রাকৃতিক-ভূগোল শিক্ষা দেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে যে, ইতিপূর্বে শিশুরা একটি ইংরেজী বানান শিক্ষার পুস্তক নিয়েই প্রায় সারাদিন ব্যস্ত থাকত এবং তাতে বিস্তর সময়ের অপচয় হত। তাই, শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য গ্যালারী ক্লাশের ব্যবস্থা শীঘ্রই চালু হতে যাচ্ছে। এর ফলে অবস্থার যে-পরিবর্তন ঘটবে তার পরিপ্রেক্ষিতে আরও বাংলা পুস্তকের প্রয়োজন হবে। আগ্রার জনশিক্ষা পরিচালকের মত মাদ্রাজের জনশিক্ষা পরিচালকও এই পরিকল্পনার দৃঢ় সমর্থক। ১৮৫৬ সালে কলকাতায় সরকার কর্তৃক নিয়োজিত 'কমিটি ফর দি ইম্‌প্রুভমেন্ট অব স্কুলস'-এর মতও তাই। এ-বিষয়ে কর্নেল পিয়ার্স নামক মাদ্রাজের জনৈক শিক্ষাবিদ কর্তৃক ১৮৫৭-৫৮ সালে সরকারের নিকট প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে উদ্ধৃত করা হল : "আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি এমন দুটি বিষয় পেশ করতে চাই যে-বিষয়গুলি পরিদর্শনের সময় আমার মনের উপর বিশেষ রেখাপাত করেছে। প্রথমটি হল, প্রাদেশিক ও জেলা স্কুলগুলিতে ইংরেজী ভাষা অধিকাংশ বিষয়ে শিক্ষা দানের একমাত্র মাধ্যম না হলেও প্রধান মাধ্যম। এ-পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের যে-সকল সুবিধাই থাকুক না কেন,

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এর অসুবিধাগুলিও নজরে না পড়ে পারে না। এসব স্কুলের কার্যক্রমের প্রধান অংশটি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে সাধিত হলেও স্কুলের সবচেয়ে অগ্রগামী শিক্ষার্থীরাও এ-ভাষায় পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান রাখে না। এসব স্কুলে বাংলা ভাষা তুলনামূলকভাবে সামান্যই শিক্ষা দেওয়া হয় বলে পরিণামে বালকেরা না পারে এদের কোন একটি ভাষাতে যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে, না পারে যথাযথ-ভাবে চিন্তা করতে। বলা বাহুল্য, যথাযথভাবে চিন্তা করার অভ্যাসটি চারিত্রিক সত্যনিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য বিধায় নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকেও, অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আধ্যাত্মিক শক্তির দিক দিয়ে আমি যা দেখেছি তাতে আমার ভয় হচ্ছে যে এসব স্কুলে অঙ্কের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা শুনতে যত গালভরাই হোক না কেন, আসলে তা এই অসৎ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যে কিছুই করে না। এ-পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ফলে বালকদের মধ্যে অপরিহার্যভাবেই যে অন্তঃসারশূন্য অহংকারের ভাব সৃষ্টির প্রবণতা রয়েছে আমাকে সে-কথাও বলতেই হবে।

আগ্রা প্রেসিডেন্সীতে দীর্ঘদিন থেকে এই ধারণা কাজ করে আসছে এবং বেনারসের জয়নারায়ণ কলেজের শেষ প্রতিবেদনে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে: "এখন আঞ্চলিক ভাষা-সমূহের মাধ্যমে অনেক বেশী পরিমাণে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রথম তিন-চার বছর ইংরেজী পড়ান হচ্ছে কেবল 'ভাষা' হিসাবে, শিক্ষাদানের 'মাধ্যম' হিসেবে ততটা নয়। এই পরিকল্পনায়, একজন এদেশীয় লোক যে ক'বছর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে ব্যয় করতে সক্ষম, সে ক'বছরের মধ্যেই অফিসে দৈনন্দিন কাজ চালাবার জন্যে প্রয়োজনীয় ইংরেজী শব্দগুচ্ছ (Pharse) ও বিশিষ্টার্থক শব্দ (terms) মুখস্ত করা ছাড়াও তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত এবং তার মনকে জ্ঞানের ভাণ্ডারে পরিণত করে। সর্বোপরি এই পরিকল্পনায় তার হৃদয় ও বিবেকের কাছে তারই আপনার চেয়ে আপন ভাষার অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে আবেদন রাখা হয়।" ডক্টর চক্রবর্তী তাঁর "Essay On Native Education" প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন, "অধিকাংশ ছাত্রেরই বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে অল্প-স্বল্প ইংরেজী আয়ত্ত করা এবং সুন্দর লিখতে শেখা যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নকলনবীশ কিংবা কেরানী হতে পারা যায়।" "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সংশ্লিষ্ট প্রবেশিকা ও অন্যান্য পরীক্ষায় বাংলা ভাষা জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষা জ্ঞানের সমান গুরুত্ব আরোপ করার ফলেও যত্ন সহকারে বাংলা পাঠের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।" একজন পরীক্ষক এ-মন্তব্য করেছেন। গত বছর মাদ্রাজের সংস্কৃতের অধ্যাপক উল্লেখ করেছেন, "মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীরা আগের চেয়ে এ-বছর দেশীয় ভাষা অধ্যয়নের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছে। এর আংশিক কারণ হল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহে ও আনকভেনেটেড সার্ভিসে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এদেশীয় ভাষাগুলিকে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আরও আংশিক কারণ হল, বর্তমানে গদ্য পাঠ-সংকলন প্রণয়ন ও সাধারণ ভাবে শিক্ষাদান পদ্ধতির মান উন্নত হয়েছে।"

দেশীয় ছাপাখানাগুলির মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সক্রিয় শক্তিগুলিকেও গণনা করা যেতে পারে, এগুলি ধীরে ধীরে হলেও নিশ্চিতভাবেই একই লক্ষ্যের অভিমুখে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে জমিদারদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষার জন্যে গৃহীত আইনসমূহ অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রজাদের শিক্ষার অভাবে এগুলির অধিকাংশ কার্যকারিতাই নষ্ট হয়ে যাবে। যে রায়ত পড়তে অক্ষম তার কাছে 'পাট্টা'র কি দাম আছে? তেমনই, খাজনার দরুন পাওয়া রশিদের গায়ে কি লেখা আছে যে জানেনা তার কাছে ওই বস্তুটির কি তাৎপর্য থাকতে পারে? এ-বিষয়ে রাশিয়ার সম্রাট এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য সম্প্রতি যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, ভূমিদাসদের যুগপৎ শিক্ষার ব্যবস্থা হল তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ-উদ্দেশ্যে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য তিনি সেখানে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেছেন। তিনি রাশিয়ার অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনে আগ্রহী।[৮১]

আমাদের ধারণা, রায়তকে পড়তে ও লিখতে শেখার জন্যে আর্থিক সুবিধাদানের নতুন ব্যবস্থার ফলে এবং জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তারের উদ্দেশ্যে সরকারের দিক থেকে আরও বেশী প্রচেষ্টা চালালে পরে, দেশীয় ছাপাখানা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারব। আগ্রা প্রেসিডেন্সীতে পল্লী-শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। বেনারসে কোন কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার দেশীয় আমিনদের (জমি পরিমাপকারীদের) প্রতারণা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে জমির পরিমাপ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার জন্যে নর্মাল স্কুলে ভর্তি হয়েছে বলে আমরা শুনেছি।

বঙ্গদেশে সম্প্রতি প্রণীত আইনে সৎ প্রজাদের জমি-জমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলাফল যত সামান্যই হোক, এর দরুন প্রজাদের নিজেদের স্বার্থেই অঙ্ক-পঠন ও জরীপ সম্বন্ধে জ্ঞান রাখতে হবে যাতে তারা জমির মাপের ব্যাপারে প্রতারনা বন্ধ করতে পারে। কেননা এ-জাতীয় প্রতারনা এখন ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। প্রজারা যদি বই-পত্র পড়তে শেখে তাহলে ৩ কোটি বাংলা ভাষাভাষীর ব্যবহারিক প্রয়োজনে বাংলা পুস্তকের চাহিদা অনেক বেড়ে যাবে।

ইতিপূর্বে বাংলা ছাপাখানাগুলির ক্ষেত্রে দেশীয় লোকদের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সহযোগিতা যে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল সোসাইটিগুলির কার্যক্রমে তাই দেখা গিয়েছে। কিন্তু ইউরোপীয়রা যদি এ-দেশীয় ভাষা না জানে তাহলে তাদের পক্ষে এ-সম্পর্কে কতটা কার্যকরী সহায়তা প্রদান করা সম্ভব?

সিভিল ও আনকভেনেটেড সার্ভিসসমূহের ক্ষেত্রে দেশীয় ভাষার পরীক্ষার ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান কড়াকড়ির দরুন এবং ইউরোপীয় স্কুলগুলিতে বাংলা অধ্যয়নের ফলে, এক শ্রেণীর ইউরোপীয়ের সৃষ্টি হচ্ছে যারা ভবিষ্যতে বাংলা ছাপাখানাগুলিকে আরও বেশী সহযোগিতা দিতে পারবে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও একই পদ্ধতি কার্যকরী করা হয়েছে।

১৮৩৮ সালের মার্চ মাসের এক আদেশ দ্বারা কাউন্সিল দেশীয় ভাষায় বিশেষ দক্ষতার জন্য আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে। শিক্ষা বিভাগের প্রত্যেক ইউরোপীয় অফিসারকে বেতন হ্রাসের ভয়ে দেশীয় ভাষার পরীক্ষায় পাশ করতেই হত। পরীক্ষার্থীকে স্কুলে ব্যবহৃত যে-কোন ইংরেজী গদ্য পুস্তক থেকে বাংলায় অনুবাদের সামর্থ্য, ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞ এদেশীয় লোকজনের সঙ্গে কোন সামুলী সমস্যা সম্পর্কে সচ্ছন্দে আলাপ-আলোচনা করার ক্ষমতা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে ভূগোল কিংবা ইতিহাসে পাঠদানের শক্তি পরীক্ষা দিতে হয়।[৮২]

'বাংলা ভাষার গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এগুলি বহু বছর যাবৎ কৃষ্ণনগর, ঢাকা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, দার্জিলিং, ভদ্রক, রংপুর, তমলুক, কটক ও কলকাতায় চালু আছে। বাবু জে. কে. মুখোপাধ্যায় ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটির সূত্রে ৫০০ টাকা ব্যয়ে কলকাতায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন এবং তার উত্তরপাড়ার জমিদারীর বিভিন্ন অংশে আরও কয়েটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। কলকাতায় কবে নতুন পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে মফস্বলের লোকদের পক্ষে তা জানা কষ্টকর। অথচ পড়ার আগ্রহ বজায় রাখতে হলে ইউরোপীয়দের মত এদেশীয় লোকদেরও নতুন পুস্তকের প্রয়োজন রয়েছে। কলকাতায় প্রকাশিত বই-পত্র ভালভাবে সরবরাহ করা হলে মফস্বলের গ্রন্থাগারগুলি কলকাতার ছাপাখানাগুলির জন্যে স্থায়ী বিজ্ঞাপনের কাজ করবে এবং নিজ নিজ জেলায় শিক্ষার আলোকবর্তিকার মত বিরাজমান থাকবে।

সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেল সোসাইটিগুলির কার্যক্রম রয়েছে। কলিকাতা বাইবেল সোসাইটি তার প্রতিষ্ঠার পর থেকে, আংশিক অথবা পূর্ণাঙ্গরূপে সংকলিত বাংলা ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকার প্রায় এক লক্ষেরও বেশী কপি প্রচার করেছে। বাইবেলের রচনা-রীতি অনবদ্য: এ-গ্রন্থে বহু শব্দ প্রচলিত অর্থ থেকে স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া, বাইবেল ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দে সমাকীর্ণ। তাই বাইবেল পাঠ করতে বুদ্ধিসম্পন্ন পাঠকের প্রয়োজন। এই অবস্থায় বাইবেল সোসাইটি যদি প্রকৃত-পক্ষে বস্তা বস্তা বাজে কাগজের সরবরাহকারীতে পরিণত হতে না চায় তাহলে তাদের বাংলা ছাপাখানাগুলির সঙ্গে সহযোগী হিসেবে, সহযোগিতা দেবার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের বই-পত্রগুলিকে ব্যবহারে লাগাতে হলে তাদেরকে অবশ্যই পাঠক সৃষ্টি করতে হবে এবং জনসাধারণকে পড়তে শেখাতে হবে। বর্তমানে এদেশের শতকরা ৯২ জন বাইবেলের মত গ্রন্থও পাঠ করতে সম্পূর্ণ অক্ষম। ধর্মীয় ক্ষুদ্র পুস্তক-পুস্তিকাগুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। 'অন্ধের চশমা'-সদৃশ এই পুস্তিকাগুলি প্রায়ই লাখে লাখে বিতরণ করা হয়েছে।

ভারতবর্ষের জন্যে একটি খ্রীস্টীয়ান 'ভার্নাকুলার সোসাইটি' গঠিত হয়েছে। এই সোসাইটিও সহযোগী হিসেবে কাজ করতে পারে। এ-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য হল এদেশীয় ছাপাখানাগুলির উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিলাতের জনসাধারণের দৃষ্টি

আকর্ষণ করা। এর নেতা হলেন আর্ল অব শ্যাফটেসবারী ও মাননীয় এ. কিনোয়ার্ড। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং ভারতবর্ষের ১৩টি প্রধান আঞ্চলিক ভাষায় পুস্তক রচনার দিকে লক্ষ্য রেখে সোসাইটি কাজ করে যাচ্ছে। কারণ "মাতৃভাষা হল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পড়ার যন্ত্র।"

দ্বি-ভাষী পুস্তক, অর্থাৎ এক পাশে বাংলা ও আর এক পাশে ইংরেজীতে রচিত পুস্তক আজকাল কমই প্রকাশিত হচ্ছে। এ-জাতীয় পুস্তক প্রকাশনায় ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে। আগে 'এনসাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস', পশ্বাবলী এবং প্রাকৃতিক দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিবিধ বৈজ্ঞানিক পুস্তক এই রীতিতেই মুদ্রিত হত। কিন্তু এদেশের লোকদের মধ্যে যারা কেবল নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাই জানে তাদের জন্য ইংরেজী বাহুল্য এবং যারা ইংরেজীও জানে তারা বাংলা অনুবাদের দরুন দ্বিগুণ মূল্য দেওয়ার পক্ষপাতী নয়।

কলকাতায় রোমানীকরণ বা রোমান হরফে ভারতবর্ষীয় তাবৎ ভাষাসমূহের বিভিন্ন অক্ষর লেখার বিতর্কটি আরম্ভ হয় ১৮৩৩ সালে। ১৮৩৭ সাল নাগাদ রোমান হরফে মুদ্রিত নিম্নলিখিত বাংলা পুস্তকসমূহ প্রকাশিত হয়েছিল: নিউ টেস্টামেন্ট—নীতিকথা, ১ম ও ২য় ভাগ—পশু-জীবনী (এক নং)—ভাষার বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ-সংক্রান্ত অনুশীলনী পুস্তক—প্রথম পাঠ—পাঠ সংকলন—ইংরেজী, বাংলা ও উর্দু অভিধান।

কলকাতা বাইবেল সমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন ডক্টর ডাফ। ১৮৫৮ সালে কমিটির এক প্রতিবেদনে রোমানীকরণ সম্পর্কে ২৫ বছরের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল এভাবে বিবৃত করা হয়েছে[৮৩]: "যদিও পূর্বোক্ত রীতিতে ভারতবর্ষের তাবৎ হরফ রোমান হরফের মাধ্যমে সুন্দর ও সুষ্ঠুরূপে লেখা সম্পূর্ণ সম্ভব তাহলেও অভিজ্ঞতা থেকে এ সাদা-মাটা কথাটি বুঝেছি যে, এরূপ রোমানীকরণ রীতি, বিশেষভাবে মহাপ্রাণ বর্ণের প্রাধান্যের জন্য, বাংলার মত সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষাসমূহের সহজাত গুণাবলীর সঙ্গে বিশেষ মিশ খায় না। সাধারণ জনসমাজের সমর্থন ও সহানুভূতি না পাওয়ায় এদেশে রোমান হরফে লেখার পদ্ধতির বিশেষ অগ্রগতি ঘটে নাই। এখানকার লোকেরা নিজেদের ভাষার বর্ণমালাই কেবল ব্যবহার করছে। রোমান হরফের মধ্যে কেমন যেন একটা বেশী রকমের বিদেশী স্বাদ-গন্ধ, একটা বেশী রকমের জবরদস্তিমূলক পরিবর্তনের ভাব আছে যে-জন্য এদেশীয় লোকদের রুচি-প্রকৃতির সঙ্গে তা খাপ খায় না।"

বাংলা ভাষার সঙ্গে খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে যে দুটি ভাষার সেগুলি হল আসামী ও উড়িয়া ভাষা। পরিণামে এ দুটি ভাষা বাংলা ভাষায় অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ এ-ভাষা দুটি যারা ব্যবহার করে তাদের সংখ্যা এত কম যে তাদের পক্ষে, ডাচ ও ওয়েলশদের মতই, নিজেদের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা মোটেই উজ্জ্বল নয়। উড়িষ্যা ও আসামে এখন পর্যন্ত ছেলেরা নিজ নিজ উপভাষায় কৃতিত্ব দেখালে পরে তাদের অধিকতর মার্জিত বাংলা ভাষা অধ্যয়নের জন্যই পাঠানো হয়। এ-ব্যাপারে সরকার বিজ্ঞতার সঙ্গে উপরের সকল শ্রেণীতেই বাংলা পড়ার জন্য উৎসাহ দিতেন।[৮৪]

উড়িয়া ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকে উদ্ভূত। এ-ভাষায় মৌলিক পুস্তকের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র অল্প কয়েকটি স্কুল পাঠ্য-পুস্তক, খ্রীস্টধর্মীয় পুস্তিকা ও হিন্দুদের ধর্মীয় পুস্তক এ-ভাষায় মুদ্রিত হয়েছে। আসামী ভাষার অবস্থা স্বতন্ত্র। এ-ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত গীতা অনূদিত হয়েছিল 'চারশ' বছর আগে। অপরদিকে ১৩শ শতক থেকে তাদের বুরঞ্জী (বুরুঞ্জী) বা আসামী ভাষায় রচিত আঞ্চলিক ইতিহাস রয়েছে। অহমিয়া ভাষার সাহিত্যের পথিকৃতেরা ছিলেন চারশ' বছর পূর্বেকার বাংলাদেশের বৈষ্ণবদেরই মত।[৮৫]

বাংলা ছাপাখানাগুলির সঙ্গে তুলনা করার জন্যে এখন আমরা, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে, ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের দেশীয় ছাপাখানাগুলির দিকে নজর দেব।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে আগ্রা প্রেসিডেন্সীতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার (যার প্রভাব দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে) সঙ্গে সহযোগিতায় মাননীয় জে. কোলভিন ও তাঁর পূর্বগামীগণের অপত্য স্নেহে স্থানীয় ছাপাখানাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ আসন দখল করেছে। আগ্রা জেলে কয়েদীদের শুধু লেখা-পড়াই শেখানো হয় না, জেলের ভিতরে প্রায় ৩০/৪০টি ছাপাখানায় কাজ করে তারা হাজার হাজার হিন্দী বই সরবরাহ করছে। তারা বাংলা-দেশের স্কুলগুলিতে ব্যবহারের জন্যে আড়াই টাকা মূল্যে বাংলা গ্লোবও তৈরি করছে। সিপাহী বিদ্রোহ জেলার উপর দিয়ে তরঙ্গের মত সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও ছাপা-খানাগুলি বেঁচে গিয়েছে। ১৮৫৮ সালে জনশিক্ষা পরিচালক ছাপাখানাগুলিতে ১০৮টি হিন্দী ও উর্দু পুস্তকের ৭,০০,০০০ কপির মুদ্রণকার্য তত্ত্বাবধান করেছেন।

'আগ্রা গভর্নমেন্ট সিলেকশনস' নং ২৫ হল ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত এ-দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলির ছক আকারে প্রদত্ত একটি প্রতিবেদন। এদের মধ্যে আগ্রায় ছিল ৮টি, বেনারসে ৫টি, কানপুরে ২টি, দিল্লীতে ৮টি, লাহারে ২টি, মুলতানে ২টি এবং আলীগড়, বারমিল, ভরতপুর, গোয়ালপুর, ইন্দোর, মীরাট, মির্জাপুর, পেশোয়ার ও শিয়ালকোটে একটি করে। উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলির মধ্যে ২৫টি ছিল উর্দু, ৭টি হিন্দী এবং একটি ছিল রোমান হরফে লেখা হিন্দী। শেষোক্ত পত্রিকাটির গ্রাহকদের মধ্যে ১০ জন হিন্দু, ৪ জন মুসলমান ছিল এবং ১৫৫ জন ছিল ইউরোপীয়ান। এর দ্বারা এদেশীয় জনসাধারণের মধ্যে রোমানীকরণ পদ্ধতি যে বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারে নাই, তা বুঝা যায়। উপর্যুক্ত পত্রিকাগুলির মোট ১,৬২,৪০৮ কপি প্রচারিত হত।

নামকরণের ক্ষেত্রে এই পত্রিকাগুলি ভারত পর্যটক, অমৃত স্রোত, বিশ্বস্ত দূত, সংবাদ বিশ্বধ্রুবতারা, কবি, পরশ পাথর ইত্যাদি রোমান্টিক নাম ব্যবহার করে তৃপ্তি পেত। সম্প্রতি রক্তপাতের ঘটনার জন্যে দিল্লী কুখ্যাত হলেও এদেশীয় ছাপাখানার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এরও ভূমিকা রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক গ্রন্থাদি উর্দু ও হিন্দীতে অনুবাদের জন্য ১৮৪৩ সালে 'দিল্লী ভার্নাকুলার ট্রান্সলেশান' প্রতিষ্ঠিত হয় মাননীয় জে. টমসন-এর

পৃষ্ঠপোষকতায়। এফ. বৌর্নৌগ নামক এক ইংরেজ দেশীয় ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে উৎসাহী এক ফরাসী ভদ্রলোক-এর সচিব ছিলেন। প্রথম বছরেই চাঁদা ও দানে ১৬,০০০ টাকার বেশী সংগৃহীত হয়েছিল। দাতাদের মধ্যে অযোধ্যার নবাব দিয়েছিলেন ১,০০০ টাকা।

[অনুবাদ : হাবীবুর রশিদ]

তথ্যনির্দেশ

৩২ বোম্বাই শহরে ট্র্যাক্ট সোসাইটি মারাঠী ভাষায় বাইবেলের কাহিনীর কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছে। অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে যে "এ দেশের অধিবাসীরা, বিশেষতঃ হিন্দুরা, তাদের নিজেদের ছন্দ-রীতিতে রচিত কাব্যগ্রন্থ পাঠে অশেষ আনন্দ পেয়ে থাকে।" এই সোসাইটি মারাঠী ভাষায় মিসেস শেরউডের ভারত-বর্ষীয় তীর্থযাত্রা, সিজারদের জীবনী, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব, মুহম্মদ ও লুথারের জীবন-চরিত, প্রাকৃতিক রহস্য, জীবে দয়া—সব কিছু মিলিয়ে স্থানীয় ভাষায় মোট ২০০ পুস্তক প্রকাশ করেছে। এ-সকল বইয়ের প্রচার বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রতি বছর আরও বেশী সংখ্যায় বিক্রয় হচ্ছে। এ দেশীয় রীতি ও আকৃতির অনুরূপ করে খ্রীস্ট ধর্মীয় পুস্তকাদি মুদ্রণের এই পদ্ধতিটি অধুনা আগ্রা প্রেসি-ডেন্সীতে সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছে। তাদের কোন কোন বই-পুস্তক দেখতে ঠিক পণ্ডিতদের পুথির প্রতিরূপ বলে মনে হবে।

৩৩ এই সোসাইটির সঙ্গে তুলনায় দক্ষিণ ভারত ক্রিস্টিয়ান স্কুল বুক সোসাইটি মাত্র ৪ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথচ এরই মধ্যে সোসাইটি তামিল ভাষায় মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে ২০টি। তন্মধ্যে আছে ধর্মীয় প্রশ্নোত্তর ২টি, পাঠ-সংকলন ৪টি, পবিত্র-স্তোত্র ১টি, তামিল ব্যাকরণ ৩টি, ধর্মীয় ভূগোল ১টি, প্রাথমিক ভূগোল ১টি, মানসাঙ্ক, কাটারের 'অস্থিবিদ্যা' ও 'স্নায়ুবিদ্যা', গ্রীনের 'আমার বাসগৃহ', এশিয়ার কতিপয় দেশের বিবরণ, উইলিয়মের 'মিশনারীদের উদ্যোগসমূহ', ম্যাথুর ভাষ্য, বাটলারের "মানব-চরিত্র সম্পর্কে ধর্মোপদেশ', 'পশ্চিম আফ্রিকা সফর', 'ধর্মগ্রন্থ সংকলন'। এছাড়া এই সোসাইটি প্রতিটি ৬ আনা মূল্যের ৩৩ × ২৭ ইঞ্চি রঙিন ম্যাপ প্রকাশ করেছে।

৩৪ এ-শ্রেণীর অন্যতম সু-রচিত নাটক হল 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়'। এ-নাটকে সমস্ত রিপু ও পাপের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে তাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা হয়েছে। এই রূপক নাটকটি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন মি. টেইলর।

৩৫ মূল গ্রন্থে "শিক্ষা" শীর্ষক অনুচ্ছেদের (২৬) পরে আর কোন অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ করা হয় নাই।

৩৬ এই আইনে অশ্লীল পুস্তক বা চিত্র বিক্রয়ের জন্য ১০০ টাকা জরিমানা ও তিন মাস জেলের বিধান আছে। এ-আইন পাশ হওয়ার পরে ৪ আনা মূল্যের তিন কপি অশ্লীল পুস্তক বিক্রয়ের দায়ে তিনজন এ-দেশীয় লোকের সুপ্রিম কোর্টে বিচার হয়। জরিমানা এবং কোর্টের যাবতীয় ব্যয় সহকারে বিবাদী পক্ষের ১,৩০০ টাকা ব্যয় হয়। এই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনায় অন্যান্য প্রকাশকেরা এমনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের অশ্লীল পুস্তকের অধিকাংশই নষ্ট করে ফেলে।

৩৭ 'বাইবেল', 'আরব্যোপন্যাস' ও 'পিলগ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' ব্যতীত 'হিতোপদেশ'-এর মত এত বেশী সংখ্যক ভাষায় আর কোন বই অনূদিত হয় নাই।

৩৮ বিখ্যাত নীতি-কাহিনী 'Reynard the Fox'—এর অনুবাদ 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হলে তা পাঠক-মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে।

৩৯ মূল ইংরেজীতে আছে 'Banaryastak'।

৪০ প্যারীচাঁদ মিত্র রচিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এবং 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯)।

৪১ মেডিকেল কলেজের বাংলা ক্লাশ—এই ক্লাশে ১০০ জন ছাত্র পড়াবার ব্যবস্থা আছে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাদের তিন বছরে ম্যাটেরিয়া মেডিকা, অস্থিবিদ্যা ও ডাক্তারী পেশা শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে এ-সকল বিষয়ে বাংলায় পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। অস্থিবিদ্যার ভূতপূর্ব অধ্যাপক মধুসূদন গুপ্ত একটি চমৎকার 'ম্যানুয়েল অব এনাটমী এন্ড ফিজিওলজী' পুস্তক এবং একটি 'ফার্মাকোপিয়া' গ্রন্থও প্রকাশ করেছেন। মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করেছে। তাঁর উত্তরসুরি শিবচন্দ্র কর্মকার ছাত্রদের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় 'ম্যাটেরিয়া মেডিকা-অজৈবিক', 'ম্যাটেরিয়া মেডিকা-জৈবিক', 'ফার্মাশিউটিক্যাল প্রিপারেশন' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এদেশীয় চিকিৎসকেরা যত বেশী সংখ্যায় পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বেন, বাংলা ভাষায় চিকিৎসা-পুস্তকের সংখ্যাও তত দ্রুত বাড়তে থাকবে।

৪২ মুসলমানী সাহিত্যে সুঅধীত ডক্টর স্প্রেঞ্জার নিম্নোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছেন: "শত শত বছর যাবৎ মুসলমানেরা তাদের ধর্ম সম্পর্কিত মূল ধারণা সম্পূর্ণ বিস্মৃত থাকার পর এখন তারা আবার তাদের পবিত্র গ্রন্থ সকলের নিকট বোধগম্য করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এর ফলে, বাইবেলের অনুবাদ ও চর্চার দরুন ইউরোপে যে ফলোদয় হয়েছিল, এখানে তারাও অবশ্যই তদনুরূপ ফল লাভ করবে। ছাপাখানার দ্রুত উন্নতির অন্যতম সুফল হিসেবে সাময়িক-পত্র ও লঘু সাহিত্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্র এশিয়ায় ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যেখানে সংবাদপত্র সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানকার উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ-সমূহে এমন কোন শহর নেই যেখানে বেশ কিছু সংখ্যক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় না। সাম্প্রতিককালে শুধু মাত্র স্ত্রীলোকদের জন্যই লিখিত বহু গল্প ও ধর্মীয় গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। বোধ হয়, এগুলির অতি দ্রুত কাটতিও হয়েছে। এখানে যে নতুন সাহিত্যের সূচনা হয়েছে যদিও তার শিল্পমূল্য খুব বেশী নয়, তাহলেও তা, ইউরোপে মুদ্রণের প্রথম যুগের মতই, দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ঝোঁক রয়েছে প্রাচ্য এবং মুসলমানিত্বের দিকে। কিন্তু তারই মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে সাধারণ সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষা ও প্রশাসনিক সুরুচির অপরিহার্য ফল ও অবদান।

৪৩ এ-সম্পর্কে Descriptive Catalogue of Bengali Books দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থপঞ্জিতে ১২৩০টি বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রিত পুরাণ গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। 'পূর্ণ চন্দ্রোদয়' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ১৮৩৮ সালের পুস্তকের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ১৩৮টি পুস্তকের মধ্যে ১৩৬টি পুস্তকই হিন্দুধর্ম-বিষয়ক। এদের মধ্যে আবার অধিকাংশই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের। বেদান্ত-বাদীরা ৪০টি গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। উচ্চাঙ্গের দার্শনিক চিন্তাভাবনা এই গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য।

৪৪ তামিল একটি অত্যন্ত প্রকাশক্ষম ভাষা। এ-ভাষায় ক্রিয়াকে বলে Myir অর্থাৎ একটি শব্দের প্রাণ, ব্যঞ্জনবর্ণকে বলে May অর্থাৎ শরীর; স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সংযোগকে বলে Uyir May অর্থাৎ সংযুক্ত শরীর; নারকেলকে বলে Ternei,

• অর্থাৎ মিষ্ট বাদাম ; বাঘকে বলে kadu অর্থাৎ অত্যন্ত ধারাল নুখ ; নদীকে বলে কাবেরী (cavery) অর্থাৎ জাফরান রঙের পানি।

৪৫ এই সংখ্যার মধ্যে সাপ্তাহিক ২,৫০০ কপি প্রচার সংখ্যা সম্বলিত শ্রীরামপুরের 'গভর্নমেণ্ট গেজেট'টি ধরা হয় নাই। 'বর্ধমান সংবাদ' এবং রংপুর থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' পত্রিকাকেও এ-সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

৪৬ এই প্রতিবেদন লেখার সময় থেকেই সংস্কৃত প্রেস 'সোমপ্রকাশ' নামে একটি শক্তিশালী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করছে। এ-পত্রিকায় বিবিধ অত্যাবশ্যকীয় খবরাখবর প্রকাশিত হয়। এ-ছাড়া, সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেও নির্ভীক মতামত ব্যক্ত করা হয়। 'চন্দ্রিকা' পত্রিকাটি তার জন-প্রিয়তার দিনে এদেশীয় লোকদের চিন্তাধারা সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিল। এ-পত্রিকায় যথাসময়ে পূজা-পার্বনের সংবাদ, রাজাদের বিবরণ, বুলবুলীর লড়াইয়ের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হত। পত্রিকাটি 'বৃহৎ ধর্মপুরাণের', 'উত্তর খণ্ডের' দোহাই দিয়ে চরক পূজার পক্ষে সমর্থন যুগিয়েছিল। পত্রিকার সম্পাদক তৎকালীন 'ইয়ং বেঙ্গল'দের 'চাটগেঁয়ে ফিরিঙ্গী' নামে অভিহিত করতেন। তিনি মনে করতেন "এদেশীয় লোকদের ইংরেজী শিক্ষা দিলে তারা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ, পবিত্র মন্ত্রাদি পাঠ করার সময়ে পঠিত কোন বিজাতীয় শব্দ অবশ্যই তাদের মনে পড়বে, যার ফলে তাদের মন্ত্র-পাঠের বিশুদ্ধি ও পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।" সম্পাদক মিশনারীদের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন, "যে-সমস্ত লোক খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করার পরও পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার আশা পোষণ করে, তাদের তুলনা করা চলে প্রবাদোক্ত সেই বিড়ালের সঙ্গে, যে-সমস্ত পাখীদের খাওয়ার জন্য পাখার আশা করে শেষে হতাশ হয়েছিল।" এসব সত্ত্বেও, মিশনারীরা যে প্রতিটি ধর্মান্তকরণের জন্যে ১০,০০০ টাকা করে পায়, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বহুল প্রচারিত এই ধারণা তিনি অবিশ্বাস্য মনে করতেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা সমর্থন করা ছিল তার প্রধান ব্রত। তাই ১৮২৫ সালে হাউজ অব কমন্স-এ সতীদাহ সম্পর্কে যে আলোচনা হয় তিনি তার বিবরণ ৭ কলামে ছাপাতেন। এ-পত্রিকাগুলিতে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক রচনাও প্রকাশিত হত। ১৮২৫ সালেই 'চন্দ্রিকা' পত্রিকায় বঙ্গদেশের জেলাগুলি সম্পর্কে অতিশয় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করে ক্রমানুয়ে প্রকাশ করা হয়।

৪৭ 'পূর্ণ চন্দ্রোদয়' ১৮৩৫ সালে হিন্দু গোঁড়ামীর অন্ধ-সমর্থক এবং 'চন্দ্রিকা'র দোসর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তখন এ-পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় একটি দেব-স্তুতি, নৈতিক বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র কবিতা, সাধারণ সংবাদ এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের বিরুদ্ধে ও হিন্দুধর্মের ক্রমাবনতির বিষয়ে অভিযোগ-পত্র প্রকাশ করা হতো। কিন্তু ১২ মাসের মধ্যেই পত্রিকাটি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হয় এবং আধুনিক শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করে। ১৮৩৯ সালে এর প্রচার সংখ্যা আট শতে পৌঁছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকাগুলি সম্পর্কে এ-পত্রিকা সর্বদাই মার্জিত রুচি বজায় রেখেছে এবং কখনো কাদা ছোঁড়াছুড়ি প্রশ্রয় দেয় নাই। এ-পত্রিকাটি হচ্ছে বাংলা বই-পত্রের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রচার-মাধ্যম।

৪৮ আরও যে-সব অত্যাচার করা হয় সেগুলি মফস্বলের জমিদার ও নীলকরপুঙ্গবদের কীর্তিরই এক নমুনা। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে দেওয়ার পর শরীরের নানা জায়গায় আগুনের গোলা দিয়ে ছেঁক দেওয়া হয়।

তার হস্তদ্বয় পিঠমোড়া করে বেঁধে তার ফাঁকে লোহার ডাণ্ডা ঢুকিয়ে তা এমন-ভাবে মোচড়ান হয় যাতে তার কাঁধের সংযোগ খুলে যায়। একজন সম্পাদককে এহেন শাস্তি-প্রদান শুধু নেপ্‌লসের রাজাকেই মানায়।

৪৯ বোম্বেতে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় মারাঠী ভাষায়, ১৮২৩ সালে। ১৮৩৩ সালের আগে মাদ্রাজে তামিল ও তেলেগু ভাষায় কোন সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় নাই। ১৮২৫ সালের দিকে কলকাতায় সংস্কৃত ভাষায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু পত্রিকাটি কয়েক বছর পরেই উঠে যায়।

৫০ মার্কুইস অব হেস্টিংস 'দর্পণ' পত্রিকার জন্য সাধারণ ডাকমাশুলের এক-চতুর্থাংশ ধার্য করার নির্দেশ প্রদান করেন। লর্ড আমহার্স্ট বিভিন্ন সরকারী অফিসে বিতরণের জন্য এ-পত্রিকার ১০০ কপির গ্রাহক হয়ে আরও বেশী বদান্যতার পরিচয় রেখেছিলেন। পরবর্তীকালে মফস্বলের প্রধান প্রধান সিভিলিয়নগণ এ-পত্রিকা ক্রয় করতেন এবং প্রায়শঃ এর মাধ্যমে তাদের নিজ নিজ জেলা সম্পর্কে তথ্য পেতেন, যা কোন সরকারী সূত্রে পাওয়া সম্ভব হতো না। এ-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় জেনে এদেশীয় লোকেরাও 'দর্পণ' পত্রিকায় পত্র লিখে পাঠাত।

৫১ 'অনুবাদিকা' পত্রিকায় সাধারণতঃ জনৈক বাঙ্গালী কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিকা 'রিফর্মার' থেকে অনুবাদ প্রকাশিত হত।

৫২ লর্ড বেণ্টিং কলমের এক খোঁচায় সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে যখন স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর কাছে সতীদাহের পক্ষে আবেদন পেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে কিনা, সে-সম্পর্কে, সতীদাহের অধিকার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত, ধর্মসভার সদস্যবৃন্দের নিজেদের মধ্যেই মতৈক্য ছিল না।

৫৩ একটি প্রয়োজনীয় পত্রিকা। দ্বি-ভাষিকতা এ-পত্রিকার জন্যে বোঝা-স্বরূপ হয়েছে—ব্যয় বেড়েছে দ্বিগুণ।

৫৪ হিন্দুদের আচার-ব্যবহার ও ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞ এক তরুণ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতের কার্য বিবরণীকে বিদ্রূপ করে 'চন্দ্রিকা'য় বিশ বছর আগে একটি চাতুর্যপূর্ণ নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। এ-পত্রিকায় একটি বৃহৎ জেলার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমলাদের ঘুষ খাওয়া বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হত। আমরা দেখছি, এক পত্রিকায় জনৈক দারোগার কাহিনী প্রকাশিত হয়েছিল; তিনি এক বছরে দেড় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন।

৫৫ নানা কাজে ব্যস্ততার দরুন দু'বছর পরে সম্পাদক পত্রিকাটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া'-র অনুসরণে সাপ্তাহিক পত্রিকাটির এই পরীক্ষামূলক প্রচার খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। এ-পত্রিকায় সংবাদ ও তথ্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে প্রকাশিত হত। এ-পদ্ধতিটি, দীর্ঘ আলোচনার তুলনায়, এদেশীয় জনসাধারণের রুচির অধিক অনুকূল ছিল।

৫৬ এ-বিষয়ে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা ১৮৩৫ সালে মন্তব্য করেছে, "বিচারালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের হিতার্থে, হাকিমদের আরাম-আয়েশের জন্যে নয়। আদালতগুলিকে ন্যায় বিচারের মন্দির হিসেবেই দেখতে হবে, জ্ঞানার্জনের মহাবিদ্যালয় হিসেবে নয়। এখানে বাংলার জনসাধারণের সঙ্গে তাদের ভাষাতেই যোগাযোগ করা দরকার।" ১৯৩১ সালে 'দর্পণ'-এর একজন সংবাদদাতা লিখেছিলেন, "ফারসী ভাষায় লেখা পরোয়ানা পেলে গ্রামের লোক ভয়ে, বর্ষার রাতে বৃষ্টির মধ্যে পিচ্ছিল পথ দিয়ে চলার সময় যেমন কাঁপে, তেমনি কাঁপতে থাকে।" একজন এদেশীয় সম্পাদক বাংলা ভাষার প্রতি আমলাদের বিরূপতা

ব্যক্ত করেছেন এভাবে, "দেশের প্রবল বাত্যায় বাংলা ভাষার সমুদ্র তরঙ্গায়িত হয়ে আমলাদের উপর এসে পতিত হলে তারা তলিয়ে যায় এবং সামনে কূল-কিনারা দেখতে না পেয়ে দারুণ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ-সব আমলাদের পেট চিরে দুভাগ করলেও বাংলা বর্ণমালার প্রথম অক্ষরটির সন্ধানও পাওয়া যাবে না।"

৫৭ ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত "সিলেকশানস ফ্রম দি নেটিভ প্রেস"-এর মতই "পশ্যাবলী" (৩য় ভাগ) এবং "পশ্যাবলী" (৪র্থ ভাগ) বই দুটিও সম্পূর্ণ এদেশীয় পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলিত।

৫৮ বাঙালীরা যে স্বদেশ থেকে অনেক দূরে গিয়েও নিজের ভাষা কি রকম ভাবে আকড়ে থাকে, বেনারসের এই ঘটনাটি সেই বিস্ময়কর ব্যাপারেরই একটি দৃষ্টান্ত। অপর এক দৃষ্টান্ত, মৌরীশাসের কুলীর দল। তারা মৌরীশাস ভাষার মাধ্যমেই বাংলা শেখে এবং কলকাতায় বইয়ের জন্য অর্ডার পাঠায়।

৫৯ রাজা নিজ ব্যয়ে নানা প্রকার পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এসব পুস্তকের মধ্যে আছে সংগীত, পাক-রাজেশ্বর (আদ্য-খণ্ড ও মধ্য-খণ্ড) ইত্যাদি।

৬০ এ-পত্রিকায় ধর্মীয় কলহ পরিহার করা হত। এর নীতি ছিল: "বিবাদ বিসম্বাদের জলে ডুবালে মনোবলরূপ তলোয়ারের ধার নষ্ট হয়ে যায়; তাকে ক্ষিপ্রগতি ও শক্তিশালী করতে হলে ভালবাসার তেলে স্নান করান দরকার।" যাই হোক, এই নীতির অনুসরণ এবং একজন হরকরা নিয়োগ করা সত্ত্বেও, এদেশের মূর্খ লোকেরা এ-পত্রিকা নিতে রাজি হত না। পত্রিকাটি একই নামে প্রকাশিত হত বলে তাদের বোধ হয় মনে হত যে প্রতিমাসে এর বিষয়বস্তুও একই রকম থাকে।

৬১ এ-পত্রিকায় প্রাচীন ব্রিটেন, রোমানদের ধর্ম ও দর্শন, এংলো-স্যাক্সন, গতি-তত্ত্ব, বাণিজ্য ও প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাটি হিন্দু কলেজের ছাত্রবৃন্দ ও মি. ওয়ালাসটোন কর্তৃক পরিচালিত হত।

৬২ বেদান্ত সভার মুখপত্র; শ্যামাচরণ বসু সম্পাদিত। লভ্যাংশ দাতব্য স্কুলে প্রদান করা হয়। এ-পত্রিকায় নীতিকথা প্রকাশিত হত।

৬৩ বেদান্তসভার প্রতিপক্ষ ও বিষ্ণুসভার মুখপত্র।

৬৪ নাম-পৃষ্ঠার বিপরীত দিকে একটি শিকল যুক্ত ক্রুশের কাঠ-খোদাই করা চিত্র ছিল। এই পত্রিকাটি যে খ্রীস্টান ধর্মের বিরোধিতা করবে এই ছিল চিত্রের তাৎপর্য। কায়স্থদের পৈতা ধারণের অধিকার বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করার পর সম্পাদক বলেছেন যে তিনি এ-বিষয়ে এক সপ্তাহে যে-সমস্ত পত্র পেয়েছেন তা তার পক্ষে এক বছরেও ছেপে শেষ করা সম্ভব নয়।

৬৫ আব্দুলের রাজা নারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় কলিকা এবং অন্যান্য পুরাণ থেকে দেখান হয় যে কায়স্থদের পৈতা ধারণের কোন অধিকার নাই।

৬৬ রেভারেন্ড কে. বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৬৭ নীতিকথা, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হত।

৬৮ একজন সম্পাদকের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন লেখকের রচনা নিয়ে চেম্বার্স সিরিজ কিংবা ট্রাক্ট সোসাইটির মাসিক গ্রন্থ খণ্ডগুলির মত একটি গ্রন্থমালা প্রকাশ করলে খুব ভাল কাজ হতো।

৬৯ প্রস্তরে অঙ্কিত নক্সা থেকে মুদ্রণ।

৭০ বাংলায় যাত্রাগানের সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতা হলেন কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত কনখলের গোবিন্দ-চন্দ্র অধিকারী, গোপাল উড়িয়া, মদন, নীলকমল সিংহ ও বদনচন্দ্র অধিকারী।

৭১ এক বছর আগে কুলমায় আমি এ-রকম একজনের গান শুনেছি। তার গানে ছিল যে একটি নির্দিষ্ট দিনে কৃষ্ণের ইচ্ছায় মৃত লোকেরা পুনর্জীবিত হবে। দেশের সমস্ত লোকেরাই তার কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত। সেই বিশেষ দিনে অসংখ্য মানুষ নদীয়ায় গিয়ে ভীড় জমালো কিন্তু কোন পুনর্জীবন দেখা গেল না।

৭২ জনৈক স্থানীয় লোক কর্তৃক সম্পাদিত 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামক একটি ইংরেজী পত্রিকা নীলকরদের সম্বন্ধে লিখেছে, "এরা হল সম্ভ্রান্ত চাষী কিংবা দরিদ্র ভাগ্যান্বেষী, যারা হিসাবের খাতায় সংখ্যা গোণার প্রাত্যহিক নিরস কাজ, কিংবা ভৃত্যদের মধ্যে ইতরোচিত মাতব্বরীর মনোভাব নিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা ছাড়া বড় কোন ভাবনা-চিন্তায় অভ্যস্ত নয়।

৭৩ এখানে উল্লেখ্য যে ইউরোপে সংস্কৃতের ৩৩ জন অধ্যাপক আছেন। সংস্কৃত হিন্দুদের সামাজিক অবস্থা, বিধি-বিধান ও ধর্মের উপর যে আলোক-সম্পাত করে এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-ভাষার যে গুরুত্ব দেখা যায়, তা থেকে বুঝা যায় যে, ভাষাতাত্ত্বিক কারণে, বিশেষতঃ স্থানীয় ভাষাগুলির উপর এর প্রভাবের দরুন, হিন্দুদের মধ্যে এ-ভাষার চর্চা অব্যাহত থাকা বাঞ্ছনীয়। এ-বিষয়ে 'এডুকেশন ডেসপাচ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, "প্রাচ্যের কলেজগুলি আঞ্চলিক ভাষাসমূহের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করা ছাড়াও, আমাদের মনে হয়, দিল্লী, বেনারস ও পুণার কলেজগুলিকে অনুসরণ করে আঞ্চলিক ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির অনুবাদ করার ব্যাপারেও বেশ সহায়ক হতে পারে। এ-বিষয়ে আমি একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। বছর তিনেক আগে, 'ধাতুমালা' নামে একটি শব্দ-প্রকরণের বই প্রকাশ করি। সে-পুস্তকে এমন চারশত সংস্কৃত ধাতুর তালিকা দেওয়া হয়েছে যেগুলি থেকে অল্প-বিস্তর সাধিত শব্দ বাংলা ভাষায় রয়েছে। বইটি বাঙালীদের দ্বারা সমাদৃত হয়েছে এবং এর পাঁচটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ছোট ছোট ছেলেরা বুঝতে পেরেছে যে সংস্কৃত ধাতু সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে বাংলা শব্দ-প্রকরণ আয়ত্ত করা সহজ হয়।

৭৪ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অনেক পুস্তক আছে যেগুলি তাদের পাঠ সংকলন ও টীকা-ভাষ্য রচনার জন্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এগুলি ইউরোপে সংস্কৃত গ্রন্থাদি সম্পাদনার ক্ষেত্রেও খুবই সহায়ক হবে। সে-জন্যেই ফউকা (Fanoauk) তার 'Vie del Baddho' নামক বিখ্যাত অনুবাদ-গ্রন্থে অস্পষ্ট তিব্বতী বর্ণনাগুলির অনুবাদের সময়ে সংস্কৃত পাঠের সাহায্য নিয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন।

৭৫

অরুণোদয়	দ্বি-মাসিক খ্রীস্টধর্মীয় পত্রিকা
নীতি প্রভা	আজিমঘর রিডার-এর অনুবাদ
ভূগোল বিজ্ঞাপক	গাণিতিক ভূগোল
মুগ্ধবোধ	সংস্কৃত-বাংলা ব্যাকরণ
মনোহর উপন্যাস	সুখপাঠ্য গল্পসমষ্টি
বিজ্ঞান মিহিরোদয়	পৌরাণিক
হিন্দুধর্ম বিধর্ম	পৌত্তলিকতা বিরোধী
দূরবীক্ষণ	পৌরাণিক
শিশুপালন	শিশুদের ব্যায়াম ও চিকিৎসা
বঙ্গদেশ সংগ্রহ	বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
ভারতবর্ষের ভূগোল	প্রশ্নোত্তরে ভারতের ভূগোল

৭৬	মানব দেহতত্ত্ব	অস্থি ও শরীরবিদ্যা
	কবিতা রত্নাকর	সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ
	শিশুবোধ	সহজ পাঠ
	নীতি-কথা	নীতি-গল্প
	কলি-কৌতুক নাটক	নাটক
৭৭	সুবোধিনী পত্রিকা	সাময়িক পত্রিকা
	ব্যাকরণ	বাংলা ব্যাকরণ
	পঞ্জিকা	পঞ্জিকা, ৫০০ কপি ১৪৪ পৃষ্ঠা, ৪ আনা
৭৮	প্রবোধ চন্দ্রিকা	নীতি-গল্প
	দায়ভাগ প্রায়শ্চিত্ত	হিন্দুদের প্রায়শ্চিত্ত সম্পর্কিত
	ভগবত সংগীত	কৃষ্ণলীলা
	ভগবৎ সিদ্ধান্ত	বৈষ্ণবদের বিধি-বিধান

৭৯ শান্তিপুরে 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি'-এর একটি নর্মাল ভার্নাকুলার স্কুল আছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে প্রকাশিত হয়েছে ধনিধর (Dhanidhar) নামে একটি মূল্যবান পুস্তক (এর সাহায্যে পোস্টালজি পদ্ধতিতে এদেশীয় একটি লোককে এক বছরের মধ্যে বাংলা পড়তে ও লিখতে শেখান যায়), পোস্টালজি পদ্ধতিতে লিখিত একটি গণিতের পাণ্ডুলিপি, রোমের ইতিহাস, প্রাচীন ইহুদীদের ইতিহাস—এ-সবই হয়েছে এখানে বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার ফলে। এখানে যখন জ্যামিতি, গাণিতিক ভূগোল, জ্যোতিষবিদ্যা ও প্রাকৃতিক ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হবে, তখন বই-পত্রের জন্য আরও চাহিদা দেখা দেবে।

৮০ প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে প্রকাশিত গ্রন্থাদি খুব সুলভ মূল্যে বিক্রয় করতে হবে, যাতে এগুলিকে তাদের উদ্দিষ্ট ক্রেতারা তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানে শুধুমাত্র জনপ্রিয় ও মনোরঞ্জক পুস্তকসমূহ প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে অনুবাদ গ্রন্থসমূহের মধ্যে অন্য কোন শ্রেণীর পুস্তক ব্যাপকভাবে প্রচারিত হবে এমন প্রত্যাশা করা যায় না। তৃতীয়তঃ অনুবাদকর্মে শুধু বাংলা ভাষার পণ্ডিতদেরই নয়, স্বদেশবাসীদের জন্য যারা সুখপাঠ্য রীতিতে লিখতে সক্ষম, তাদেরও কাজে লাগাতে হবে। বলাবাহুল্য, এ-গুণটি বেশ দুর্লভ।

৮১ ক্রিমিয়ার যুদ্ধ এবং ভূমিদাসদের মুক্তির জন্য গৃহীত কার্যক্রম রাশিয়ার কৃষকদের ভাবিয়ে তুলেছে। বাড়ীর কর্তারা, কেউ রাশিয়ান খবরের কাগজ পড়ে তাদের চাষীদের শোনালে, তাকে বিনা মূল্যে জলখাবার সরবরাহ করেন। তার ফলে সেইন্ট-পিটার্সবার্গে এখন রাশিয়ান ভাষায় ৪০টি সংবাদপত্র চালু আছে।

৮২ ভারতবর্ষে চার্চ মিশনারী ও গসপেল প্রপোপেশান সোসাইটিগুলির বিরাট ধর্মপ্রচারক সম্প্রদায় রয়েছে। তারা এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছে যে কোন মিশনারীকে সংশ্লিষ্ট জেলার আঞ্চলিক ভাষার পরীক্ষা পাশ না করা পর্যন্ত সে-জেলার কোন জায়গায় নিয়োগ করা যাবে না। অন্যান্য সোসাইটিগুলিরও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার সম্ভবনা রয়েছে। এর ফলে স্থানীয় সাহিত্যের উন্নয়নমূলক কাজে মিশনারীদের আরও বেশী সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কলকাতার বিশপ মহোদয় সম্প্রতি ধর্মপ্রচারক মণ্ডলীতে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীদের প্রয়োজনের মান নির্ধারণ করে বলেছেন, "প্রত্যেক প্রার্থীকেই, তিনি যে-ভাষার মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার করবেন সেই ভাষায়, একটি ক্ষুদ্র ধর্মীয়-ভাষণ লিখতে হবে। ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে

যেখানে তারা ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবেন সেই জেলার আঞ্চলিক ভাষায় তাদের পরীক্ষা দেয়া-নেয়া হবে।" কোন চ্যাপলেইন এদেশীয় ভাষায় উত্তীর্ণ হলে তাকে ১,০০০ টাকার পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। বঙ্গ-দেশের গভর্নরও সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, সকল স্কুল পরিদর্শককেই স্থানীয় ভাষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। মফস্বলে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের অভাবগ্রস্ত দো-ভাষীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া সরকারের পক্ষে আদৌ উচিত হবে না। তাদের উচিত রাশিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করা। সেখানে তাদের যে-সকল কর্মচারী এশিয়া-খণ্ডে নিয়োজিত, তাদের জন্য অন্ততঃ দুটি প্রাচ্য ভাষা জানা বাধ্যতামূলক।

৮৩ ইংরেজী বানানের ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়ম খুবই অনুমোদনযোগ্য হলেও বিলাতে তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। আগ্রা প্রেসিডেন্সীতেও, সামরিক বাহিনীর অল্প শিক্ষিত ও মিশনারী স্কুলের এতিম বালকদের কথা বাদ দিলে, অন্যত্র রোমানীকরণ পদ্ধতির মোটেই অগ্রগতি হয় নাই। রোমান হরফে মুদ্রিত সচিত্র সংবাদ ও সাময়িকপত্র হিসেবে মির্জাপুরে 'খায়ের হিন্দু' পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয় ১৮৩৭ সালে। কিন্তু এদেশীয় লোকদের মধ্যে এ-পত্রিকার গ্রাহক ছিল মাত্র ১৭ জন। রোমান হরফে বহু বই বিলিও করা হয়েছে। চীনা ভাষায় ছাপা বই নিতে এদেশের লোকেরা দ্বিধা করে না শুধু কাগজ পাওয়ার লোভে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে মুদ্রাকরদের পক্ষে পৌনঃপুনিক হারে ব্যবহৃত প্রচুর গ্রন্থের ও উচ্চারণ চিহ্নের ব্যবস্থা করার অসুবিধার দরুন রোমান হরফে বাংলা বই মুদ্রণের কাজ খুবই কঠিন।

৮৪ অনুরূপ ভাবে সাঁওতাল ও ছোটনাগপুরের লোকেরা হিন্দী পড়তে আগ্রহী। কারণ এর মাধ্যমে তারা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের হিন্দুদের আরো বেশী সংস্পর্শে আসতে পারবে।

৮৫ আসামী ভাষায় অনূদিত মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে ৬৫টি গ্রন্থ এখন বর্তমান আছে। এগুলি প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং বহু শতাব্দী পূর্বে রচিত। এ-ভাষায় ৪২টি নাটক আছে, এগুলি সম্পূর্ণ মৌলিক। রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী এদের বিষয়বস্তু। চিকিৎসা-বিষয়ক প্রধান গ্রন্থসমূহও এ-ভাষায় অনূদিত হয়েছে।